



सिंग आरा

जिम गोमेन्सा

# बनिउय ५९

इन्हीं द्वारा  
प्रभागीय बोर्ड

# তিন গোয়েন্দা স্রিজ

চোরের আস্তানা

রাকিব হাসান

**স্বীকৃতি:** তিন গোয়েন্দার বাংলায় এই e-book টি তৈরিতে সব ধন্যবাদ সেবা প্রকাশনীর প্রতি। তিন দেশের বাজালি পাঠক যেন ইটারনেট থেকে সহজে ডাউনলোড করে পড়তে পারে সেজন্য এই চেষ্টা। ছবির Resolutions হাই রেখে Quality ৫০% কম করে ফাইল ছটো করছি, এই জন্য আমি আন্তরিক ভাবে ঝমাপ্রথী।

Book Scanned By: Saurav

Feedback: [saurav2015@gmail.com](mailto:saurav2015@gmail.com)

Best Viewed at 128%



বিল্ডিং কার্পেট  
সোরের আক্তানা

## চোরের আক্তানা

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

গ্রীনহিলস ।

কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে বসে গল্প করছে  
তিনি গোয়েন্দা। সঙ্গে রয়েছে ফারিহা আর  
কিশোরের কুকুর টিটু। দলে যুজ হয়েছে আরও  
তিনজন: অনিতা, ডলি আর বব। গ্রীনহিলস স্কুলে  
পড়ে। মুসা আর বিবিনের বন্ধু। গোয়েন্দাগিরির  
বেজায় শখ। বড়দিন ধরে মুসা আর বিবিনকে চাপাচাপি করে কিশোরকে রাজি

করিয়ে দলে যোগ দিয়েছে। 'বড়দিনের ছুটিতে একটা কেসে কাজও করেছে।  
গুদের ওপর মোটামুটি সন্তুষ্ট এখন কিশোর। কাজেই তিনি গোয়েন্দার যে কোন  
আলোচনায় এখন ওরাও অংশ গ্রহণ করে।

বড় একটা জগে কমলার বস তৈরি করে রাখছে ফারিহা। একটা প্রেটে  
রয়েছে সাতটা বার্গার। আর একটা বড় ডগ বিস্কুট।

প্রেটের দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না টিটু। যেন, তার ডয়, লাক দিয়ে উড়ে  
চলে যাবে বিস্কুটটা।

টিটু ছাড়াও আড়চোখে আরও অনেকে বার্গারের দিকে তাকাচ্ছে।

কিশোর জিঞ্জেস করল, 'ফারিহা, তোমার বস বানানো শেষ হয়েছে? হলে  
দিয়ে দাও।' বার্গারের প্রেটটা তুলে নিল সে। এক এক করে দিতে লাগল  
সবাইকে। ডগ বিস্কুটটা টিটুর দিকে ছুঁড়ে দিল সে। মুখ হাঁ করে লুকে নিল টিটু।

কুড়মুড়, মচমচ নানা রকম শব্দ শোনা যেতে লাগল। সবার চিবানোর শব্দ।

'হ্যা, বলো এবার,' কিশোর জিঞ্জেস করল, 'রহস্যময় কিছু নজরে পড়েছে  
কারও?'

না, কারও কিছু নজরে পড়েনি। জানাল সবাই।

অনিতা তাকাল কিশোরের দিকে। 'ছুটির আটাশ দিন হয়ে গেল। কিছুই  
ঘটছে না আর গ্রীনহিলসে। বড় বিরক্তিকর। কোন রহস্যাই যদি না থাকল,  
গোয়েন্দা সেজে বসে থাকার আর মানেটা কি?'

গ্লাসে কমলার বস ঢালতে ঢালতে ফারিহা বলল, 'আমিও অনিতার সঙ্গে  
একমত। বসে বসে আড়তা দিয়ে আর খেয়ে খেয়ে মোটাই হচ্ছি কেবল। কিছু

একটা করতে না পারলে আর সময় কাটছে না।'

'কি করতে চাও?' একটা গ্লাস তুলে নিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'রহস্য নেই, ঠিক আছে,' ফারিহা বলল, 'কিন্তু অন্য কিছু তো করতে পারি আমরা। রেড ইন্ডিয়ান সাজতে পারি। ছবরেশে সদেহজনক লোকের পেছন পেছন গিয়ে দেখতে পারি, ওরা কোথায় যায়, কি করে। রহস্য একটা আবিষ্কার করেও ফেলতে পারি এ ভাবে।'

'তা রেড ইন্ডিয়ানটা কি ভাবে সাজব?' ডলির প্রশ্ন।

'কি ভাবে আর। পালক দিয়ে মুকুট বানিয়ে মাথায় পরব। মুখে রঙ মাথার। রঙচঙ্গে কাপড় পরব। এ কোন কঠিন কাজ নাকি?'

'ভাল বুদ্ধি,' বলে উঠল বব। 'ইন্ডিয়ান সেজে বনের মধ্যে তুকে পড়ব আমরা। দুই ভাগে ভাগ হয়ে দু'দিকে সরে যাব। তারপর তাড়া করব মুসাকে। মুসা লুকিয়ে পড়বে। ওকে খুঁজে বের করব আমরা। কারণ ও হবে ভিন্দেশী। খুব মজা হবে।'

'থাক থাক, অত মজার দরকার নেই,' হাত নেড়ে মান করে দিল মুসা। 'চারদিক থেকে আমার গায়ের ওপর এসে ঝাপিয়ে পড়ো, আর আমি মাটিতে চিংপটাই। উহু, বাবা, ভাবতেই ভাল লাগছে না আমার।'

'ঝাপিয়ে পড়ব কেন?' ফারিহা বলল। 'ওধু খুঁজে বের করব তোমাকে। বনের মধ্যে ইন্ডিয়ান সেজে লুকোচুরি খেলা! সত্যি, দারুণ মজা হবে!'

কান থাড়া করে ফেলল টিটু। চাপা গরগন্দ শুরু করল। ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

'কে জানি আসছে,' বলে, উঠে গেল কিশোর। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

খোঝা বিছানো পথে জুতোর শব্দ হলো। এগিয়ে আসছে। জোরে জোরে থাবা পড়ল দরজায়। এত জোরে, চমকে গেল সবাই।

ঘাউ ঘাউ শুরু করে দিল টিটু।

'কে?' ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ঝামেলা!' জবাব এল। 'তোমার কুকুটাকে ধরে বাধো। তারপর দরজা খোলো। কথা আছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা। হীনহিলস গায়ের পুলিশম্যান কলস্টেবল ফগর্যাম্পারকট।

ফগ হঠাৎ? রহস্যের খোজ পেল নাকি?

'অ্যাই, টিটু, থাম!' ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিল কিশোর। আস্তে করে

ঢুলে দিল দরজাটা।

ঘরের তেতরে উকি দিল ফগ। গোল আলুর মত গোল চোখ আরও গোল হয়ে গেল। 'বাহু, সবাই আছ দেখছি। কিসের আলোচনা হচ্ছিল? কোন রহস্য?'

'না, এমনি বসে বার্গার খাচ্ছিলাম,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা তো ভাবলাম, আপনিই বোধহয় কোন রহস্যের খোজ দিতে এসেছেন।'

'না, তা নয়,' ফগ বলল। 'ক'দিনের ছুটি নেবার ইচ্ছে। ভাবলাম, নেয়ার আগে একবার খোজ নিয়ে যাই, কোন রহস্য আছে কিনা। তাহলে আর নিতাম না। সমাধানটা একেবারে করে তারপরেই নিতাম।'

'দুঃখিত,' কিশোর বলল। 'কোন রহস্যের খোজ নেই আমাদের কাছে। সেই আলোচনাই করছিলাম। প্রায় একটা মাস নিরাখিয় বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেছি।'

'অ!' হতাশ মনে হলো ফগকে। 'তাহলে আর অকারণে বসে থেকে কি করব। ছুটি নিয়ে বরং বাইরে থেকে একবার ঘুরেই আসিগে। চলি, শুভ-বাই।'

ঘুরে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল আবার ফগ।

তার গোড়ালি কামড়ালোর জন্মে পাগল হয়ে গেল টিটু। কিশোরের একটা চড় থেয়ে শান্ত হলো।

কয়েক পা গিয়ে ফিরে তাকাল আবার ফগ। 'আমি বেলা একটা পর্যন্ত আছি। এর মধ্যে কোন কেস পেলে ফেলন করে জানিও আমাকে।'

তারপর আর থামল না সে। দ্রুতপায়ে গেটের দিকে চলে গেল। সাইকেলটা রেখে এসেছে গেটের বাইরে।

দরজাটা লাগল না আর কিশোর। চুপি চুপি ফিরে এসে আড়ি পাততে পারে ফগ। সে-সুযোগ দিল না তাকে।

## দুই

বেলা আড়াইটায় আবার কিশোরদের ছাউনিতে মিলিত হলো ওরা।

বলা বাহ্য, কোন কেস পায়নি। অতএব ফগকেও ফেন করা হয়নি। আশা করল সবাই, ও ছুটি নিয়ে চলে গেছে। ঝামেলা গেছে। নইলে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করতে থাকত।

বেড ইন্ডিয়ান সেজে এসেছে সবাই। প্রস্তরের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল ওরা। অন্যদের দিকে তাকিয়ে বুকাতে পারছে নিজেকে কেমন লাগছে।

ভয়ঙ্কর চেহারার একটা কুড়াল তুলে নিল কিশোর। ফরিহা তো তয়ই পেয়ে গেল দেখে। হেসে জানাল কিশোর, আসল কুড়াল নয়। কাঠ দিয়ে তৈরি। রূপচী কাগজ দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়েছে ফলাটা। নাটক-থিয়েটারে এ সব জিনিসই ব্যবহার করা হয়।

‘চলো, এবার রওনা হওয়া যাক,’ বলল সে। ‘হয়ার ফরেস্টে যাব আমরা। ফরিহা আব বকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। রবিলের সঙ্গে যাবে অনিতা আব ডলি। দুই দলই মুসাকে খুঁজে বের করে ধৰার চেষ্টা করব। দেখা যাবে, কারা আগে পারে।’

‘ই, কারা আগে পারে,’ বিড়িরিড়ি করে বলল মুসা। ব্যাপারটা এখনও পছন্দ হচ্ছে না তার। ‘খুঁজে বের করে গাছের সঙ্গে বেঁধে তীর মারা শুরু করো, তারপর মরি আরকি আমি। তোমাদের জন্যে খেলা বটে, আমার জন্যে মৃত্যু-ঈশ্বরের সেই ব্যাঙের গল্পটার মত।’

‘না, একেবারে মেরে ফেলা হবে না,’ কথা দিল তাকে কিশোর।

অঙ্গুত ভাবে মুখে রঙ করেছে ওরা। মুসা বাদে। ববের হাতে একটা রবারের ছুরি। টিউর গায়ে বসিয়ে দেয়ার ভঙ্গি করল সে। সত্যি সত্যি ভয়ঙ্কর এক দল ইন্ডিয়ানের মতই মনে হচ্ছে ওদের।

হয়ার ফরেস্টে রওনা হলো ওরা। মাঠের ওপর দিয়ে সরাসরি গেলে মাত্র আধ মাইল দূরে হবে। বনের একধারে একটা হস্ত প্রাসাদ আছে। নাম ওরিয়ান ফোট। চারপাশ ঘিরে উঠু দেয়াল।

‘বনে গিয়ে আমার দল নিয়ে বায়ে সরে যাব, রবিন যাবে ভানে,’ কিশোর বলল। ‘মুসা চুকবে মাঝখানে। ও যখন চোকে, চোখ বক্ষ করে রাখব আমরা। এক থেকে একশো শুরু হবে খৌজা।’

‘আব আমাকে কি করতে হবে?’ মুসা জিজ্ঞেস করল।

‘তুমি আমাদের দেখার চেষ্টা করবে,’ কিশোর বলল। ‘যাকে দেখবে, তার নাম ধরে তাক দেবে বেরিয়ে আসার জন্য। সে তখন খেলা থেকে বাদ। কিন্তু যদি কেউ তোমার অলঙ্কে গিয়ে তোমার কাঁধে হাত রেখে চিংকার করে ওঠে, তুমি তখন তার বন্দি। এ রকম খেলার জন্যে উপযুক্ত জায়গা হয়ার ফরেস্ট।’

ঠিকই বলেছে কিশোর। বানা বকম গাছপালা, ঝোপোড়ে তরো বনটা। ঘাসে ঢাকা। ওল্লু আব লতারও অভাব নেই। বড় গাছ, ছোট গাছ সব রকমের গাছই আছে। লুকানোর জায়গার অভাব নেই। এত বেশি ঝোপোড় আছে, ওল্লোর

আড়ালে থাকলে সহজে চোখে পড়বে না।

বনে পৌছে আলাদা হয়ে দুই দল দুদিকে রওনা হয়ে গেল। বাকি দুই দিকের এক দিকে রয়েছে বেড়া, অন্য দিকে ওরিয়ান ফোটের দেয়াল উঠে গেছে খাড়া। চার দিক ঘেরা অবস্থায় তেতর থেকে যদি সবার চোখকে ঝাঁকি দিয়ে বেরিবে যেতে পারে মুসা, চালাকই বলতে হবে তাকে।

বনের মাঝখানে গিয়ে দোড়াল সে। অপেক্ষা করতে লাগল। যেই কিশোর একটা কুম্ভাল উচু করে ধৰে চোখ বুজে একশো গোণা শুরু করল, একটা গাছের দিকে দৌড় মারল। যত দ্রুত পারল গাছ বেয়ে উঠে গেল ঘন ডালপাতার কাছে। একটা ডালের গোড়ায় লুকিয়ে বসে আপনমনে হাসল।

‘যত পারো খৌজা এখন।’ আপনমনে বলল মুসা, ‘খৌজাই সাব হবে। সাব বন চমে ফেলেও পাবে না আমাকে। তারপর ঝালত হয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে যখন বসে পড়বে, গাছ থেকে নেমে গিয়ে এমন এক চিংকার দেব, বুকের খড়ফড়নি বন্ধ হয়ে যাবে।’

গোণা শেষ। ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল ছয় জন বেড ইন্ডিয়ান। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল লতাগুল, লম্বা ঘাস আব ঝোপোড়ের মধ্যে দিয়ে।

ডালপাতার নড়া দেখেই বুঝে ফেলছে মুসা, কে কোথায় আছে। কারণ সে রয়েছে ওপরে। পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। মুচকি মুচকি হাসছে। দারুণ মজা। নাহ, চোর হওয়াটাই ভাল হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে তার মজাটাই বেশি।

ইঠাঁৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। অবাক লাগল। ওরিয়ান ফোটের উচু দেয়ালের চূড়ায় একটা লোক। মুসা ভালমত তাকানোর আগেই লাফ দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। ঝোপের মধ্যে শব্দ হলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর চুপ। লোকটাকে আব একবারের জন্যও দেখা গেল না।

ঘটনাটা কি? অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সে। দেয়ালের ওপর কি করছিল লোকটা?

কি করবে বুঝে উঠতে পারল না মুসা। চিংকার করবে? এই সময় দেখতে পেল কিশোরকে। লোকটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে, সেদিকে এগিয়ে চলেছে। নিশ্চয় শব্দ কানে গেছে তার।

আসলেই গেছে। শব্দ শব্দে কিশোর মনে করেছে, মুসা। ঝোপের ভেতরে গিয়ে লুকিয়েছে। কাজেই সে-ও এগিয়ে চলেছে সেদিকে।

আপনমনেই হাসল আবার মুসা। কিশোর ভাবছে, ঝোপের ডাল সরালেই

রেখেছে লোকটা। মুসার এতটাই কাছে রয়েছে, তার হাঁপানোর শব্দও কানে আসছে মুসার।

পাথর হয়ে গেছে যেন সে। লোকটা কে? দেয়ালের ওপর কি করছিল? লুকিয়ে আছে কেন বসের মধ্যে? গোয়েন্দারা এখানে রেড ইন্ডিয়ান সেজে খেলতে আসবে জানা থাকলে কোনমতই আসত না এখন হেয়ার ফরেস্টে, এটুকু পরিষ্কার।

মুখ তুলে তাকালেই তাকে দেখে ফেলবে। ভয়টা এ কারণেই পাছে মুসা।

নিচে সবাই ডাকাডাকি করছে। নেমে যেতে বলছে। সাহস পাছে না মুসা। জবাব দেয়ার সাহসও নেই। দম নিতেও ন্তর পাছে, লোকটা যদি শুনে ফেলে। বার বার খোদাকে ডাকছে, যাতে হাঁচি চলে না আসে। কিংবা কেশে না ফেলে। ইন্দুরের মত হিঁর হয়ে বসে অপেক্ষা করছে কি ঘটে দেখাব জন্যে।

লোকটা ও তার মতই হিঁর হয়ে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে নিচে, ছেলেমেয়েগুলোর দিকে। ইস, 'সঙ্গে করে টিটুকে নিয়ে আসা উচিত ছিল-আফসোস করছে মুসা, সহজেই তাহলে লোকটার গুৰু খুঁজে এখন চলে আসত গাছের গোড়ায়।

তাকে যে ফেলে আসা হয়েছে তার কারণও আছে। এত বেশি উত্তেজিত হয়, চেচামেচি করে, লুকেচুরি খেলা অসম্ভব। তা ছাড়া কে কোথায় আছে, নিমিষে গিয়ে খুঁজে বের করে ফেলবে। খেলা খতম।

অনেক ডাকাডাকি, ঝোজাখুঁজি করেও মুসার সাড়া না পেয়ে কিশোর বলল, 'আমার মনে হয় ধূরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বাঢ়ি চলে গেছে সে। চলো, আমরাও চলে যাই। লোকটাকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না বোবাই যাচ্ছে।'

হতাশ দেখে তাকিয়ে থেকে ওদের চলে যাওয়া দেখল মুসা। বন থেকে বেরিয়ে সরু মেঠোপথে নামতে দেখা গেল ওদের।

লোকটা ও দেখছে সবই। ঘোৎ করে একটা শব্দ করে গাছ বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

ওপর থেকে শুর চাঁদি আর কান ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাছের গোড়ায় নেমে এত দ্রুত আবার হারিয়ে গেল বোপের মধ্যে আর কিছুই দেখতে পেল না মুসা।

লোকটা নেমে যাওয়ার পরও আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল সে। আর কোন সাড়া পেল না লোকটার। কি করবে এখন? নেমে যাবে? সারারাত তো আর বসে থাকা যাবে না গাছের ওপর।

## চার

গাছ থেকে নেমে পড়ল মুসা। গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে সাবধানে তাকাতে লাগল চারপাশে। কাউকে দেখা গেল না। লোকটা নেই।

'খিতে একটা দৌড় মারা দরকার,' তাবল সে। আরেকবার চারপাশে তাকিয়েই মারল দৌড়। কেউ বাধা দিল না ওকে। কেউ চিন্কার করল না। মাঠের মধ্যে বেরিয়ে দৌড়ানোর সময় লজ্জাই পেল, এত ভয় পেয়েছে বলে, যখন দেখল গুরুগুলো তার দিকে তাকিয়ে আছে চোখ বড় বড় করে।

সোজা চলে এল কিশোরদের বাড়িতে। নিশ্চয় এখনও আছে সবাই। বাগানের পথ ধরে ছুটল ছাউনির দিকে। দরজাটা বদ্ধ। ভেতর থেকে কথার শব্দ আসছে।

দরজায় জোরে জোরে থাবা মারতে শুরু করল সে। 'এই, জলদি খোলো! আমি।'

দরজা খুলে দিল কিশোর। 'এসো, ভেতরে এসো। বনের মধ্যে এত চেচালাম, জবাব দিলে না কেন? শুনতে পাওলি?'

'পেয়েছি,' ঘরের ভেতর পা দেখে বলল মুসা। 'খবর আছে। দারুণ খবর।'

'কি?' একসঙ্গে প্রশ্ন করল সবাই। মূখের রঙ মুছতে মুছতে থেমে গেল কেউ কেউ।

'কিশোর যখন বোপ থেকে বেরিয়ে এসে চিন্কার করে ডাকতে লাগল,' মুসা বলল, 'সবাই শুনেছি আমি। কাছেই ছিলাম। গাছের ওপর।'

'ও, কীকিয়েছি!' বলে উঠল ডলি। 'এটা তো রেড ইন্ডিয়ান খেলার নিয়ম নয়!'

'কে বলল নিয়ম নয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল মুসা। 'রেড ইন্ডিয়ানরা কি গাছে চড়তে পারে না নাকি? যাকগে, তোমার সঙ্গে বকবকানির সময় নেই। আসল কথা বলি। গাছে চড়ে বসে ছিলাম আমি। দেখি একটা লোক বোপ থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসছে। আমার গাছটায় চড়তে শুরু করল। কিশোর যাকে দেখতে পেয়েছে সেই লোকটাই হবে।'

'বলো কি!' চেঁচিয়ে উঠল ডলি। 'তারপরও তুমি কি করলে?'

'কিছু না,' জবাব দিল মুসা। 'আমি অনেক ওপরে উঠে বসে ছিলাম। এত চোরের আস্তানা

ওপৰে উঠল না সে। আমিৰ নিচেই থাকল। কিশোৰ দেখাৰ আগেই ওকে আমি দেখেছি। ওৱিয়ন ফোটোৰ দেয়ালেৰ ওপৰ উঠেছিল। ওখান থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে তুকে পড়েছিল বোপেৰ মধ্যে।

'তাৰপৰ?' উভেজনা চেপে রাখতে পাৰছে না ফাৰিহা। 'শেষে কি কৰলে?'

'তাৰমাৰ সবাই চলে গেলে লোকটাৰ নেমে পড়ল গাছ থেকে। বোপে তুকে হারিয়ে গেল। আমি তখন গাছ থেকে নেমে দৌড়ে বেৱিয়ে এলায় বন থেকে। সত্যই, খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

'এ রকম আচৰণ কৰল কেন লোকটা?' অবাক হলো রবিন। 'দেখতে কেমল?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'শুধু কান আৰ মাথাৰ চাঁদি দেখেছি ওৱ। কিশোৰ দেখেছে হয়তো।' কিশোৰেৰ দিকে তাকিয়ে জিজেস কৰল, 'দেখেছি?

'দেখেছি, মোটায়ুটি,' কিশোৰ বলল। 'বোপেৰ মধ্যে আলো কম ছিল, ঝীন শেভ, কালো চৰ-অতি সাধাৰণ চেহাৰা। মনে রাখাৰ মত নয়।'

'তাৰমানে ধৰে নিতে হৰে ওৱ সঙ্গে এটাই আমাদেৱ শেষ দেখা,' ডলি বলল। 'হাতেৰ কাছে এসেও ফসকে গেল একটা রহস্য। লোকটা ওখানে কেন এসেছিল, কি কৰছিল, কোনদিনই জানতে পাৰব না আমৰা।'

'আমাদেৱ বিকেলটাৰ মাটি কৰল,' অমিতা বলল। 'তবে ও না এলেও মুসাকে খুঁজে বেৰ কৰতে পাৰতাম না। এৱপৰ যখন এ ধৰনেৰ খেলা খেলতে ঘাৰ আমৰা, নতুন আইন কৰা উচিত-গাছে চড়া ঘাৰে না।'

দেৱি হয়ে যাচ্ছে দেখে ফাৰিহা বলল, 'আজ তো আৰ কথা বলাৰ সময় নেই। এৱপৰ কৰবে মীটিঙে বসছি আমৰা?'

'বুধবাৰ বিকেলে বসা যেতে পাৰে,' কিশোৰ বলল। 'চোখ কান খোলা রাখবে সবাই। কোন রহস্যাই যেন ফসকে না যায়। আজ লোকটাকে ধৰতে পাৰিব বটে, কিন্তু কোনদিনই পাৰব না জোৱ দিয়ে বলা যায় না। আমি শিওৱ কোন ধৰনেৰ অকাজ কৰতে এসেছিল ওখানে সে।'

ছাউনি থেকে বেৱিয়ে ঘাৰ ঘাৰ বাঢ়ি ফিরে চলল সবাই। মুসা ঘাৰে রহস্যাময় লোকটাৰ কথা বিশেষ ভাবছে না আৰ কেউ। তবে রাতেৰ সংবাদে লোকাল চিভিৰ একটা ব্যবৰ আৰাব কান খাড়া কৰে দিল সবার।

'ওৱিয়ন ফোটোৰ বৰ্তমান মালিক মিসেস মার্থা ওৱিয়নেৰ অপূৰ্ব সুন্দৰ, দায়ী একটা মুজৰা হার আজ বিকেল বেলা চুৱি গেছে তাৰ শোৱাৰ ঘৰ থেকে,' সংবাদ পাঠক পড়ল। 'বাঢ়িৰ কেউ দেখেনি চোৱটাকে। কেউ কোন শব্দও শোনেনি। চুৱি

কৰে নিৱাপদে পালিয়ে গেছে সে।' শোনাৰ সঙ্গে সঙ্গে সোফায় সোজা হয়ে বসল কিশোৰ। 'তাৰমানে ওই ব্যাটাকেই দেখেছি আমৰা!' চিৎকাৰ কৰে উঠল সে। 'এখুনি কোন কৰা দৱকাৰ মূলাদেৱকে!

ভাগিস আশেপাশে কেউ নেই। মেরিচাটী বাগ্নাঘৰে রাশেদ পাখা স্টাডিতে, জৱাৰী কাজে ব্যস্ত। তাৰ চিৎকাৰ কানে গেল না কাৰও।

## পাঁচ

সে-ৱাতে সাংঘাতিক উভেজিত হয়ে রইল গোয়েন্দাৱা সবাই। পৰদিন সকাল সাড়ে নটায় মীটিং ভেকেছে কিশোৰ।

পৰদিন সময়মত হাজিৰ হয়ে গেল সবাই। ছাউনিতে আগে থেকেই বসে আছে কিশোৰ। একেকজন কৰে এল, আৰ দৱজা খুলে দিতে লাগল সে। সবাই হাজিৰ হলে শুরু হলো মীটিং।

'ফগটা গেছে বাঁচা গেছে,' কিশোৰ বলল। 'নইলে ঠিক এতক্ষণে নাক গলানো শুৱ কৰে নিত আমাদেৱ এখানে। নেকলেস চুৱিৰ সমাধান মিচ্চয় এত তাড়াতাড়ি কৰে ফেলতে পাৰত না সে।'

'তা পাৰত না,' মুসা বলল। 'তবে ফগ বা থাকাতে যজা অনেকখানিই মাটি হলো আমাদেৱে।' ফগেৰ নাম শুনে চিটুকে কান খাড়া কৰে ফেলতে দেখে তাৰ দিকে তাকিয়ে হাসল সে, 'কি বলিস, চিটু?'

কি বুৱল কুকুৰটা কে জানে, তবে মুসার কথাৰ জবাব দিল জোৱাল কৰে, 'খুক! খুক!'

'মুসা,' কিশোৰ বলল, 'কাল যে লোকটাকে দেয়ালে চড়তে দেখেছিলে তুমি, আমি ঘাকে বোপেৰ মধ্যে দেখে ফেলেছি, আমাৰ বিখাস সেই লোকটাই চুৱি কৰেছে মিসেস ওৱিয়নেৰ হারটা।'

'সত্যি?' চোখ বড় বড় কৰে বলল অমিতা।

'হ্যা,' মাথা ঝাঁকাল কিশোৰ। 'সে ছাড়া আৰ কেউ না। এখন কথা হলো, আমৰা এখন কি কৰলৈ? হারটা খুঁজে বেৰ কৰতে পাৰলৈ, তাৰপৰ চোৱটাকে ধৰা গোলৈ, মন্দ হত না। ভালই একটা গোয়েন্দাগিৰি হয়। কি বলো?'

দীৰ্ঘ নীৱৰতা। চৃপচাপ ভাবতে লাগল সবাই। অবশ্যে বৰ জিজেস কৰল, তোৱেৰ আস্তাৱা

‘কি তারে ধরবং দেখেছি তো ওকে কেবল তৃমি আর মুসা, তা-ও পলকের জন্যে, ভালমত দেখতে পারোনি।’

‘তা ঠিক,’ মুসা বলল, ‘আমি তো চেহারাটাও দেখতে পাইনি। খালি তার কান আর চান্দি। শুধু এটুকু দেখে কাউকে শনাক্ত করা অসম্ভব। তা ছাড়া ওকে ধরার জন্যে জনে চান্দি দেখে তো আর বেড়াতে পারব না।’

হেসে ফেলল ফরিহা। ‘একটা মই সঙ্গে রাখলে জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে তোমার জন্যে। যখনই সন্দেহজনক কাউকে দেখবে, তার কাঁধে মই ঠেকিয়ে উঠে পিয়ে চাঁদিটা দেখে আসবে।’

আরও দু’তিনজন হাসল তার কথায়।

রবিন বলল, ‘পুলিশকে জানালে কেমন হয়?’

‘জানাতে পারলে তো ভালই হত,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। ‘কিন্তু কি বলব ওদের? কাজে লাগে এমন কোন তথ্য দিতে পারব না। দেয়াল থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছি একটা লোককে, শুধু এটুকু বলে কোন লাভ নেই। তারচেয়ে আমার মনে হয় খালিকটা খোজ খবর করে দেখি দরকার আমাদের, কিছু বের করতে পারি কিনা।’

‘তবে আমার মনে হয়,’ রবিন বলল আবার, ‘পুলিশকে আগে জানিয়ে রাখা ভাল। তাহলে বিপদে পড়লে তাদের সাহায্য চাওয়া সহজ হবে।’

তোট নেয়া হলো। পুলিশের কাছে যাবার পক্ষেই তোট বেশি পড়ল। সুতরাং ছাউলি থেকে বেরিয়ে শহরে বেগুন হলো ওরা। ফগ নেই। তার জায়গায় সাময়িক কাউকে দেয়া হয়েছে কিনা, তা-ও জানে না। সরাসরি ক্যাপ্টেন রবার্টসনের সঙ্গে দেখা করারই সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

ধানায় এসে বাইরের ঘণে ডিউটিরত এক তরুণ পুলিশ অফিসারকে ডেক্সে বসে থাকতে দেখা গেল। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কিশোর বলল, ‘ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে? একটা বিশেষ খবর নিয়ে এসেছি আমরা। মিসেস মার্যাদ ওরিয়নের চুরি যাওয়া হারটার ব্যাপারে।’

তরুণ অফিসার মুখ খোলার আগেই কি কাজে যেন দরজায় বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। গোয়েন্দাদের দেখে হাসি ফুটল মুখে। ‘আরে, তোমরা! কি ব্যবর?’

‘ওই চোরটার ব্যাপারে, স্যার,’ জবাব দিল কিশোর। ‘কাল মিসেস ওরিয়নের হারটা যে চুরি করেছে। কাল বিকেলে ওকে বাড়ির বাইরের দেয়ালে চড়তে দেখেছে মুসা। দেয়াল থেকে লাফিয়ে নেমে ঝোপে চুকেছিল। সেখানে আমি তাকে দেখে ফেলেছি। আমাকে দেখে দৌড়ে গিয়ে একটা গাছে চড়ল। তার

আগেই সেটাতে উঠে বসে ছিল মুসা।’

প্রশ্ন করে করে প্রতিটি কথা ওদের কাছ থেকে শুনে নিলেন ক্যাপ্টেন। সম্ভল মনে হলো তাঁকে। বললেন, ‘একটা কথা বুবতে পারছি না, ওরিয়ন ফোর্টের ওই সাংঘাতিক উচু দেয়ালে চড়ল কি করে সে? বানরের মত বাইতে পারে নাকি? মই বাবহার করেনি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যাই হোক, আমার কাছে এসে যে খবরটা দিয়ে গেলে, সে-জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। অনেক ধন্যবাদ তোমাদের। চোখ খোলা রেখো। বলা যায় না, আবার সামনে পড়ে যেতে পারে লোকটা।’

‘কিন্তু সামনে পড়লেও তাকে চিনব কি করে বুবতে পারছি না,’ ক্যাপ্টেনের উপস্থিতিতে যেন নিজেকেই প্রশ্নটা করল কিশোর। ‘আমি দেখেছি এক পলকের জন্যে। শুবই সাধারণ চেহারা। মুসা দেখেছে শুধু ওই চান্দি আর কান। যাই হোক, চেষ্টার জটি করব না। যে করেই হোক খুজে বের করার চেষ্টা করব লোকটাকে।’

ধানা থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তায় নামল ওরা।

‘এখন আমরা সোজা সেই জায়গাটায় চলে যাব,’ কিশোর বলল, ‘যেখানে লোকটাকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছে মুসা। কোন না কোন সূত্র নিশ্চয় পেয়ে যেতে পারি, কে জানে!'

## ছবি

দল বেঁধে আবার হয়ার ফরেস্টে রওনা হলো ওরা, আগের দিন বিকেলে যেখানে রেড ইন্ডিয়ান খেলতে গিয়েছিল।

‘ঠিক কোনখানে লাফিয়ে পড়েছিল লোকটা; দেখাও তো?’ মুসাকে জিজেস করল কিশোর।

ভালমত দেখিল মুসা। একটা হলি ঝাড়ের দিকে আঙুল তুলল।

‘ওই যে হলি ঝাড়,’ বলল সে, ‘আর ওই ওকের চারটা। দুটোর মাঝখানে পড়েছিল।’

‘এসো,’ কিশোর বলল, ‘কাছে গিয়ে দেখি।’

দলবল নিয়ে গাছ দুটোর মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে। ওখান থেকে মুখ তুলে তাকাল দেয়ালের ওপর দিকে।

দশ-এগারো ফুটের কম হবে না। মই ছাড়া ওই দেয়ালে কি করে উঠল

লোকটা? সবচেয়ে লম্বা মানুষের পক্ষেও হাত তুলে দেয়ালের ওপরটা ধরা সম্ভব নয়। বেয়ে ওঠা অসম্ভব।

'এই যে, এখানে নেমেছিল,' হঠাৎ চিংকার করে উঠল অনিতা। মাটির দিকে চোখ। হলি ঝাড়টা থেকে সামান্য দূরে গভীর দাগ হয়ে আছে।

সবাই দেখল।

'হ্যা, পায়ের দাগই মনে হচ্ছে,' বব বলল। 'কিন্তু এ দিয়ে কি সাত হবে? জুতোর পুরো ছাপটা বসলেও নাহয় কাজ হত। এ তো শুধু গোড়ালি।'

'দেয়ালের অন্যপাশে গেলে কেমন হয়?' কিশোর বলল। 'ভাগ্য ভাল হলে পুরো পায়ের ছাপই হয়তো পেরে যাব। চলো, গিয়ে মালীকে বলে কয়ে দেখি তুকতে দেয় কিনা। আমাদের দুধ দেয় যে লোকটা, তার বক্স ওই মালী। আমাকেও চেনে।'

'ভাল বুদ্ধি,' বব বলল।

কারও অস্ত নেই। সুতরাং বাড়ির গেটের দিকে রওনা হলো ওরা। সামনের বাগানে কাজ করছে মালী। লোহার বিশাল গেটটার কাছেই। ডাক দিতে মুখ তুলে তাকাল।

'বিটেল,' চিংকার করে বলল কিশোর। 'আমাদের একটু তুকতে দেবেন? চোরটার ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি। কাল বিকেলে ওকে বনের দিকের দেয়ালের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে দেবেছি। পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। তারা বলল চোখ খোলা রাখতে। সে-জন্যেই সামান্য খৌজ-খবর করতে এসেছি।'

হাসল বিটেল। গেট খুলে দিল। 'তোমাদের সঙ্গে এলে নিচ্য কোন অসুবিধে হবে না? আমার মাথায়ই চুকছে না অত উচ্চ দেয়াল টপকাল কি করে লোকটা! কাল বিকেলে সারাক্ষণই এখানে কাজ করেছি আমি। গেট দিয়ে ঢুকলে দেখতে পেতাম। এদিক দিয়ে আসেন।'

দেয়ালের ধার ঘেঁষে এগোল গোয়েন্দারা। সঙ্গে এল বিটেল। দেয়ালের ওপর দিয়ে হলি ঝাড় আর ওকের চারার মাথাটা দেখতে পেল মুসা। দাঁড়িয়ে গেল।

'এখানেই দেয়ালের ওপর দেখেছি তাকে,' বলল সে। 'পায়ের ছাপগুলো আছে কিনা এখন দেখা যাক।'

দাগ পাওয়া গেল মাটিতে। তবে পায়ের ছাপ নয়।

খুকে ভাল করে দেখতে লাগল সবাই দাগগুলো।

'অস্তু, তাই না?' আনন্দে বিড়বিড় করল কিশোর, 'গোল গোল, তিন ছুট চওড়া, ঝাড়ুর মাথা দিয়ে খুঁচিয়েছে যেন কেউ মাটিতে।...না, খৌচায়নি, চাপ

দিয়েছে। দাগগুলোর দূরত্ত একটা থেকে আরেকটার প্রায় সমান। জুতোর গোড়ালি হতেই পারে না। কিসের দাগ এগুলো, বিটেল, বলতে পারেন?'

'না, পারব না,' বিমুচ্চের মত মাথা নাড়ল বিটেল।

সবাই তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। গোল দাগগুলোর রহস্য ভেদের চেষ্টা করছে। যতই দেখছে, ততই হিঁর নিশ্চিত হচ্ছে, লোহার গোল আঁটা পরানো ঝাড়ুর মাথা দিয়ে মাটিতে জোরে জোরে চাপ দিয়েছে কেউ। কিন্তু এ কাজ কেন করল? ঝাড়ুর সঙ্গে দেয়ালে চড়ারই বা কি সম্পর্ক?

'মই যে ব্যবহার করেনি, বাজি রেখে বলতে পারি,' বিটেল বলল। 'আমাদেরগুলো সব ছাউনিতে তালা দিয়ে রেখেছি। চুরির খবর শোনার পর গিয়ে দেখেও এসেছি ওগুলো। যেখানে রেখেছিলাম স্থানেই আছে সব। চোরটা কি করে দেয়ালে চড়ল, আমার মাথার চুকছে না কেননতেই।'

'আমার মনে হচ্ছে লোকটা দড়াবাজিকর,' দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ফারিহা। চোখে পড়ল একটা জিনিস। উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'দেখো দেখো, কি ওটা?' হাত তুলে বলল সে। 'ওই যে, দেয়ালের ওপরের দিকে ইটের কোনটা বেরিয়ে আছে যে ওটাতে।'

সবাই তাকাল।

'উলের মত মনে হচ্ছে,' অনিতা বলল। 'মনে হয় চড়ার সময় চোরটার কাপড়ে ইটের খোঁচা লেগেছিল। ছিঁড়ে আটকে গেছে সুতোটা।'

'দেখি, এখানে এসো তো, মুসা,' বলে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। 'দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াও। তোমার কাঁধে চড়ে নামিয়ে আনি ওটা। জরুরী স্বত্ত্ব হতে পারে।'

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। মুসার কাঁধে চড়তে কিশোরকে সাহায্য করল রবিন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল কিশোর। ইটের কোনা থেকে খুলে নিল উলের টকরোটা। লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। দেখার জন্যে ঘিরে এল সবাই। মাথা ঠোকারুকি হয়ে গেল।

খুব সাধারণ একটা জিনিস। নীল রঙের উলের সুতো, তাতে এক গাছি লাল সুতোও রয়েছে। গভীর মনোযোগে সুতোটা দেখতে লাগল সবাই।

'মনে হচ্ছে চোরটার জারসি থেকে ছিঁড়ে রয়ে গেছে,' অবশ্যে বলল কিশোর। 'তারমানে এখন নীল রঙের একটা পুলওভার পরা লোককে খুঁজতে হবে আমাদের। পোশাকটায় লাল রঙের সুতোও আছে।'

এরপর আরও একটা জিনিস খুঁজে পেল ওরা। উত্তেজনা বাড়ল তাতে।

চোরের আস্তনা

## সাত

সূত্রটা খুঁজে বের করল টিটু। শুরু থেকেই মাটি ওঁকে চলেছে সে। মাঝে মাঝেই মুখ তুলে এদিকে শোকে, ওদিকে শোকে। মাটিতে বসে যাওয়া গোল চিহ্নগুলো শুকতে শুকতে আচমকা ঘাউ ঘাউ শুরু করল সে।

সবাই তাকাল ওর দিকে।

‘কি হয়েছে, টিটু?’ জিজেস করল কিশোর।

চিঢ়কার করতেই থাকল কুকুরটা। খানিকটা ঘাবড়েই গেল মেয়েরা-ফারিহা, অনিতা আর ডলি। এমন করে চেচাচে কেন? চারপাশে তাকাতে শুরু করল ওরা। যেন ভর পাছে বোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে দেখবে কাউকে।

ওপর দিকে মুখ তুলে পাগলের মত চিঢ়কার করেই চলল টিটু।

‘আরে থাম!’ ধমক লাগাল কিশোর। ‘কি দেখেছিস বলবি তো? থাম না! আহ্বাৎ!’

টিটুর দেখাদেখি সবাই মুখ তুলল। দেখতে চাইল কি দেখে অমন চিঢ়কার করছে কুকুরটা। ওরাও দেখতে পেল। একটা সুর ডালের ভাঙা শুকনো মাথায় আটকে রয়েছে একটা ক্যাপ।

‘আরি! ক্যাপ!’ চিঢ়কার করে উঠল কিশোর। ‘চোরের নাকি?’

‘চোর ওটা ওখানে ছুঁড়ে দিতে যাবে কেন?’ ফারিহার প্রশ্ন। ‘চোরেরা নিশ্চয় পালানোর সহয় গাছের ডালে ফেলে রেখে যায় না তাদের ক্যাপ?’

এত উচ্চতে, ক্যাপটার কাছে পৌছানো মুশকিল। দেয়ালের মাথা যতটা উচ্চতে, তার চেয়ে বেশি। খোঁচা দিয়ে ফেলার জন্যে একটা লাঠি আনতে গেল বিটেল।

‘ছুঁড়ে মেরেই কেবল ওখানে বোলানো সম্ভব,’ বব বলল। ‘এ থেকেই বোৱা যাব ক্যাপটা চোরের নয়। কোন চোর এ ভাবে ক্যাপ রেখে যাবে না। নিজেকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে এ রকম মূল্যবান সূত্র।’

‘তা ঠিক,’ কিশোর বলল, ‘চোরের ক্যাপ এটা না-ও হতে পারে। নিশ্চয় কোন ভবস্থুরে দেয়ালের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ছুঁড়ে ফেলেছিল।’

একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ফিরে এল বিটেল। ওটার মাথা দিয়ে খোঁচা মেরে

মাটিতে ফেলল ক্যাপটা। সঙ্গে সঙ্গে ওটার ওপর ঝাপিয়ে পড়ল টিটু।

‘ফেল, টিটু; রেখে দে!’ চিঢ়কার করে উঠল কিশোর।

মুখ থেকে ফেলে দিল টিটু। আহত মনে হলো তাকে। এ রকম ব্যবহার করা হলো কেন তার সঙ্গে? ক্যাপটা সেই তো আবিকার করেছে। করেনি? একবার অস্তত শুন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুকে নেয়ার সুযোগ দেয়া উচিত ছিল তাকে।

ময়লা পুরানো ক্যাপটা দেখতে লাগল গোয়েন্দারা। মোটা সুতো দিয়ে বানানো। এক সময় বোপ খোপ ডিজাইন ছিল। এখন এতই ময়লা, দেখাই যাব না প্রায়।

মুখ বাঁকিয়ে জিমিসটার দিকে তাকাল ফারিহা। ‘উহ, কি ময়লার ময়লা রে! ভবস্থুরেটাও বোধহয় মাথায় রাখতে পারছিল না আর, ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল দেয়ালের ওপর দিয়ে। গাছে গিয়ে আটকেছে। এটা কোন সূত্র না।’

‘আমারও মনে হয় না,’ টুপিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল বিবিন। ‘রেখে আর কি হবে। আমাদের কোন কাজে লাগবে না এটা। আত খুশি হওয়ার কিছু নেই রে, টিটু। এমন সাংঘাতিক কোন আবিকার করে ফেলিসনি।’

ক্যাপটা দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেল বিবিন।

বাধা দিল কিশোর। ‘রাখো, রাখো! ফেলে দিও না। বলা যাব না কিছু। ফেলে দেয়ার পর যদি বুঝতে পাবি মূল্যবান সূত্র ছিল এটা, পরে তাহলে মাথার চুল ছেঁড়া হাড়া উপায় থাকবে না। যদিও এখন কোন রকম সূত্রই মনে হচ্ছে না এটাকে আমার কাছে।’

‘এই দুর্গঞ্জওলা টুপি তাহলে তোমার কাছেই থাক,’ কিশোরের হাতে তুলে দিল বিবিন। ‘বাপরে বাপ, কি বিটকেলে গন্ধ! নোংরার হন্দ লোকটা।’

নিরিবাদে টুপিটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল কিশোর। নীল উলের সুতোটা সাবধানে ভরে রাখল মোটবুকে। তারপর মাটির দিকে তাকাল আবার, গোল গোল দাগগুলোর দিকে।

‘আমার মনে হয় এগুলোও একটা নেট রাখা দরকার,’ মুখ তুলল সে। ‘কারও কাছে মাপার কোন কিছু আছে?’

ববের কাছে একটা সুতোর গোলা পাওয়া গেল। সাবধানে দাগগুলো মাপল কিশোর। সুতোর গিট দিয়ে চিহ্ন রাখল যাতে বোৱা যায় দাগগুলো কতখানি চওড়া। প্রতিটি দাগই এক রকম, এক সমান, কোন হেরফের নেই। মাপা শেষ করে গিটের কাছ থেকে কেটে নিয়ে সুতোর এই টুকরোটা ও মোটবুকে রেখে দিল।

‘আমার মনে হচ্ছে এই দাগগুলোও কোন ধরনের সূত্র,’ মোটবুকটা পকেটে

রাখতে রাখতে বলল কিশোর। 'কিন্তু কি এগুলো, এখন কোন ধারণাই করতে পারছি না।'

বিটেলকে গুড়-বাই জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। মাঠের ওপরের রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরে চলল। সূত্র যা পাওয়া গেছে, সেগুলো খুব একটা সুবিধের লাগল না ওদের কাছে। তবে হাল ছাড়তে রাজি নয় কিশোর পাশা।

'আমি এখনও বলছি,' ফারিহা বলল, 'কোন দড়াবাজিকরের কাজ। সাধারণ লোকের পক্ষে ওই দেয়াল টপকানো অসম্ভব।'

মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় উঠেছে ওরা। যেন ফারিহার কথার সমর্থনেই একটা দেয়ালের কাছে এসে দেখতে পেল বড় একটা পোস্টার লাগানো রয়েছে। নির্বিকার ভঙ্গিতে ওটার দিকে তাকাল ওরা। কিন্তু হঠাৎ এমন চিন্কার করে উঠল রবিন, চমকে গেল সবাই।

'দেখো কাণ্ড!' চিন্কার করে বলতে লাগল সে। 'আরে এ তো সার্কাসেরই পোস্টার। দেখো না কৃত কিছু আছে, সিংহের খেলা, ঘোড়ার খেলা, ভালুক, ভাঙ্ড়...আর এই দেখো দড়াবাজিকর। দড়াবাজিকর, আরে! ফারিহা বলতে না বলতেই সার্কাস পার্টি এসে হাজির।'

'বলতে না বলতে নয়,' কিশোর বলল, 'ও বলার আগেই এসেছে ওরা। তাঁরুটারু খাটানোর পর পোস্টার লাগিয়েছে।'

একে অন্যের দিকে তাকাতে থাকল ওরা। ভীষণ উৎসেজনার কারণ মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোচ্ছে না। সবার মনেই এক ভাবনা, ওখানেই গিয়ে খোজা দরকার। পারলে এখনই!

## আট

ঘড়ি দেখল কিশোর।

'ধূর!' হতাশ কঠে বলল সে। 'লাঞ্ছের সময় তো হয়েই গেল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। আড়াইটার সময় আবার আমাদের বাড়িতে চলে এসো সবাই। আলোচনায় বসব।'

'উহ,' ডলি বলল। 'আমি আর অনিতা পার্টিতে যাচ্ছি। না গিয়ে পারব না।'

'আমাদের বাদ দিয়ে মীটিংটা কোরো না, কিশোর,' অনুরোধ করল অনিতা।

'আমিও আসতে পারব না,' বব বলল। 'বাড়িতে জঙ্গুরী কাজ আছে, মা বলে দিয়েছে। মীটিংগে কাল বসলে কেমন হয়? চোরটা যদি সার্কাসের দড়াবাজিকরেই হয়ে থাকে, তাহলে এক রাতে সে পালিয়ে যাচ্ছে না। সার্কাস যতদিন থাকে, সে-ও থাকবে।'

'সার্কাসের লোক হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। আমি আসলে কিছু ভেবে বলিনি,' ফারিহা বলল। 'আমার মনে হয়েছিল দড়াবাজিকরের পক্ষে সন্তুষ। সার্কাস পার্টি এসে গেছে এখানে, জানিই না।'

'যাই হোক, তদন্ত করে দেখা দরকার,' কিশোর বলল। 'সার্কাস পার্টিটা এসেছে বলেই চুরিটাও হয়েছে, তার কারণ চোর ওখানেই লুকিয়ে আছে। সে যাকগে, এ সবই অনুমান। ঠিক আছে, কাল সকাল সাড়ে নটায় আবার মীটিং। ইতিমধ্যে অনেক সময় পাবে ভাবার। সূত্রগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে কালকে জানিও কে কি ভেবেছে। সার্কাসে যাওয়ার কোন দরকার আছে কিনা, সেটাও ভেবে দেখো।'

সারাটা দিনই সেদিন ভাবল সবাই। এমনকি পার্টিতে বসেও ফিসফিস করে আলোচনা করল ডলি আর অনিতা।

'সার্কাসে গিয়ে খোজাটাই ঠিক হবে মনে হচ্ছে আমার কাছে,' অনিতা বলল। 'তোমার কি মনে হয়, ডলি? দড়াবাজিকরদের দিকে নজর রাখা যাবে ওখানে গেলে। লোকটাকে দেখলে হয়তো চিনেও ফেলতে পারে কিশোর।'

পরদিন সকালে যখন কিশোরদের ছাউনিতে মীটিং বসল, আলোচনার শুরুতেই বলে উঠল বব, 'আমি সার্কাসে যাবার পক্ষে।'

'আমার আর অনিতারও একই মত,' ডলি বলল।

'আমিও,' রবিন বলল।

মুসা আর ফারিহাও সার্কাসে যাবার পক্ষে।

'তোমার কি মত, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'গেলেই ভাল হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আজ বিকেল থেকে শুরু হচ্ছে শো। আমার ইচ্ছে, সবাই যাব আমরা। তবে বেশি আশা কোরো না। লোকটাকে মাত্র এক নজর দেখেছি, তা-ও বোপের ভেতরের আবহা অঙ্কারে। দড়াবাজিকরদের মধ্যে সে থাকলেও দেখে চিনতে পারার আশা খুবই কম।'

'তৃষ্ণি বললে ক্লীন শেভ করা ছিল ওর,' মুসা বলল। 'কালো চুল। আমি দেবেছি চাঁদিতে বিছিরি একটা গোল টাক। তোমার দেখা আর আমার দেখা

চোরের আস্তানা

মিলে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে চেহারার। তবে এটুকু দিয়ে কোন লোককে খুঁজে বের করা সত্যিই কঠিন।

‘টাকা আছে তোমাদের কাছে?’ আচমকা প্রশ্নটা ছুড়ে দিল অনিতা। ‘সার্কাসের টিকেট কেনার? আমার কাছে একটা ফুটো পয়সাও নেই। যা ছিল সমস্ত দিয়ে কাল বার্থডে পার্টির উপহার কিনে নিয়ে গেছি।’

যার যার পকেট হাতড়ানো শুরু করল ওরা, কিশোর বাদে। যে যা পেল বের করে এনে সামনের একটা বাক্সের ওপর রাখল। টেবিলের বিকল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বাক্সটা।

গুনে দেখল কিশোর। বলল, ‘অনেক কম। অসুবিধে নেই। বাকিটা আমি দিয়ে দেব।’

সবাই জানে ওরা, প্রচুর হাতবরাচ পাওয়া কিশোর। সব সময়ই টাকা থাকে তার পকেটে।

আরও খানিক আলোচনার পর কিশোর বলল, ‘তাহলে ওই কথাই রইল। সার্কাস শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগে সার্কাসের মাঠে হাজির থাকবে সবাই। দেরি করবে না কিন্তু। দাল রঙের সুতোর শিশুগ আছে এমন নীল পুলওভার পরা কাউকে দেখলে তার ওপর নজর রাখবে। একটা ব্যাপারে আমি শিওর, ওই রঙের উলের কাপড় ছিল চোরটার পরনে।’

কাঁটায় কাঁটায় সময়ে সার্কাসের মাঠে হাজির হয়ে গেল ওরা। টিকেট বর্তের কাছে গিয়ে সাতটা টিকেট কিনল কিশোর। ভীষণ উত্তেজিত সব। সার্কাস জিনিসটাই মজার, তার ওপর মেখানে যদি চোর খুঁজতে যাওয়া হয়, তাহলে তো আরও মজা।

ভেতরে ঢুকে সীটে বসল ওরা। চোখ বিশাল তাঁবুটার মাঝের গোল জায়গাটার দিকে। রিং। যেখানে সার্কাস দেখানো হবে। একটা বাঁশি বেজে উঠল। দ্রিম দ্রিম বাড়ি পড়ল ঢাকে। শুরু হলো ব্যাড। রিঙের দিকে তাকিয়ে থেকে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হচ্ছে ছেলেমেয়েরা।

যোড়াগুলোকে ঢোকানো হলো। কেমন গর্বিত পদক্ষেপ ওদের। মাথায় বিশেষ ব্যবস্থায় খাড়া করে রাত্তির পালক গোঁজ। একপাশে সারি দিয়ে দাঢ় করিয়ে রাখা হলো ওদের। এল ভাড়েরা। ডিগবাজি খেতে খেতে ঢুকল রিঙের মধ্যে। সমানে চিংকার করছে। ভালুকগুলোকে আনা হলো এরপর। একের পর এক খেলোয়াড়েরা এসে ঢুকতে লাগল রিঙের মধ্যে। আন্তরিক হাসি-হেসে স্বাগত জানাতে লাগল দর্শকদের।

দড়াবাজিকরদের খেলা দেখানোর অপেক্ষায় অস্ত্র হয়ে রইল গোয়েন্দারা। ভাড় আর ভেলিকিবাজ আছে মোট পাঁচজন, দু'জন আছে রন-পায় ঢড়ে হাঁটে, সাইকেলের খেলা দেখানোর জন্যে আছে আরও পাঁচজন-তাদের বিচ্ছিন্ন সাইকেলগুলো নিয়ে হাজির। এদের মধ্যে নিশ্চয় অনেকেই দড়াবাজির খেলা জানে, কিন্তু কে কে, বলা কঠিন।

‘প্রথমে ঘোড়ার খেলা,’ রবিন-বলল। ‘সঙ্গে ভাড়েরা তো থাকছেই। তারপর আসবে দড়াবাজিকরেরা।’

সুতরাং অপেক্ষা করে রইল ওরা। ঘোড়ার খেলা দেখে মুক্ষ হয়ে হাততালি দিতে লাগল। ভাড়দের কাণ দেখে হাসতে হাসতে পালি এসে গেল চোখে। গেট ব্যাথা করতে লাগল।

‘এইবার আসবে দড়াবাজিকরেরা!’ উত্তেজিত কষ্টে বলল কিশোর। ‘মুসা, খেয়াল রাখো।’

## নয়

দড়াবাজিকরেরা এল। সোজা হয়ে পায়ে হেঁটে নয়। চার হাত-পা ছড়িয়ে শরীরটাকে চাকার মত ঘোরাতে ঘোরাতে। একজন এল দুই হাতে হেঁটে। পাতুলে শরীরটাকে উল্টো করে ঘুরিয়ে এনে এমন গোল করে ফেলল, মাথাটা চুকে গেল দুই পায়ের ফাঁকে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে।

কিশোরের গায়ে গুঁতো দিল মুসা। ‘কিশোর, দেখো, এই লোকটার ঝীল শেক্ষ। কালো চুল। বোপের মধ্যে একেই দেখেনি তো?’

মাথা ঝাকাল কিশোর, ‘হ্যা, এ-ও হতে পারে। বাকি সবার তো দেখা যাচ্ছে গোফ আছে। একমাত্র এরই নেই। দেখা যাক, উচ্চতে লাফিয়ে ওঠার খেলা দেখায় কিনা।’

সাত জোড়া চোখ আঠার মত সেঁটে রইল যেন এই লোকটার গায়ে। বাকি সবার গোফ আছে যেহেতু, সন্দেহের তালিকা থেকে ওরা বাদ, কিন্তু এ লোকটার গোফও নেই, চুলও কালো। ওদের সন্দেহভাজন লোকটি এরই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

লাফিয়ে কি শুন্যে উঠতে পারে ও? খাড়া দেয়ালে কি ভাবে ঢড়তে হয়

দেখাবে ওদের? আগাহে ফাটিতে ফাটিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। দড়াবাজিকরদের মধ্যে এই লোকটাই সবচেয়ে দক্ষ, তার খেলা দেখেই বোঝা গেল। পালকের মত হালকা যেন ওর শরীর। রিঞ্জের মধ্যে এমন করে লাক বাঁপ দিচ্ছে, মনে হচ্ছে স্প্রিংের সাহায্যে ছুঁড়ে মারছে শরীরটা, নেমে আসছে অতি আলতো ভঙ্গিতে, যেন মাটিই ছুতে চাইছে না পা।

দড়িতে হাঁটার ব্যাপারেও ভীমণ দক্ষ সে। মাটি থেকে অনেক উচুতে তাঁরুর প্রায় চূড়ার কাছাকাছি একটা লম্বা দড়ি টানটান করে বাধা হয়েছে। একটা লম্বা মই খাড়া করে দেয়া হয়েছে ওখানে ওঠার জন্যে। এমন ভাবে তরুতর করে উঠে যেতে লাগল সেটা বেয়ে, মনে হতে লাগল বারো ফুট উচু একটা দেয়াল বেয়ে ওঠা সম্ভব এ লোকের পক্ষে।

'মনে হচ্ছে এই লোকটাই আমাদের চোর,' কিশোরের দিকে কাত হয়ে এসে ফিসফিস করে বলল ফারিহা।

সম্ভাবনা আছে। তবে হ্যানা কিছু বলল না কিশোর। অন্য কাউকে সন্দেহও হচ্ছে না। তাই আর কারও ওপর নজর না দিয়ে এরপর আরাম করে বসে সার্কাস দেখতে লাগল ওরা।

শুরু ভাল সার্কাস। খেলুড়ে ভালুকরা এল এরপর। নিজেরা নিজেরা বঞ্চিং খেলল খনিকচক্ষণ। তারপর ঘুসোঘুসি শুরু করল ওদের ট্রেনারের সঙ্গে। একটা বাচ্চা ভালুক তার ট্রেনারের এতই ভক্ত হয়ে পড়েছে, এমন করে পা আকড়ে ধরে রইল, ছাড়তেই চায় না।

ফারিহার শুরু দৃঢ় হতে লাগল, ইস্য, এ রকম একটা পোষা ভালুক ছানা যদি প্রাক্ত তার! অনিতার দিকে কাত হয়ে বলল, 'বড় সাইজের পুতুলের মত, তাই না!'

মাথা বাঁকাল অনিতা।

আবার খেলা দেখাতে এল দু'জন ভাঁড়। তাদের পর রন-পাওলারা। রন-পায় চড়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। ওদের পেছনে লাগল ভাঁড়েরা। মুখ ভেঙ্গে, জিভ দেখিয়ে, হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে এগোল ভাঁড়েরা। ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল রন-পা থেকে। কিন্তু এতই দক্ষ রন-পাধারীরা, কোন মতেই ফেলা গেল না ওদের।

এরপর ভেতরে এনে চোকানো হলো শক্ত একটা বাঁচা। সিংহের বাঁচা। গর্জন করে উঠল সিংহগুলো। কুঁকড়ে গিয়ে পেছনে সরে যেতে চাইল ফারিহা।

'এগুলোকে আমার ভাল লাগছে না,' বলল সে। 'বাপরে, ওই সিংহটাকে

দেবো, টুলের ওপর ঢুঁকে। ভাবসাব ভাল না মোটেও, দেবেছ। ট্রেনারের ওপরই না লাফিয়ে পড়ে।'

কিন্তু পড়ল না সিংহটা। নিজের কাজ বোবে ওটা। বাকি সিংহগুলোর সঙ্গে মিলে দারুণ সব খেলা দেখাতে লাগল। গরগর করছে, গর্জন করছে, মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ভাবে হিসিয়ে উঠছে, বেড়াল গোষ্ঠীর প্রাণীরা যা করে। খেলা দেখানো শেষ করে ট্রেনারের নির্দেশে এক এক করে খাচায় ফিরে গেল আবার ভয়াল প্রাণীগুলো।

তারপর চুকল বিরাট একটা হাতি। নানা রকম খেলা দেখানো শেষে যখন তার ট্রেনারের সঙ্গে জিঙ্কেট খেলতে শুরু করল, বল ছুঁড়ে মারল দর্শকদের দিকে, ফেটে পড়ল যেন পুরো ভাঁড়। হই-হট্টগোল, চিৎকার, হাততালিতে কানে তালা লাগান জোগাড়।

শো এতই ভাল লাগল গোয়েন্দাদের, খেলা শেষে আবার যখন মাঠে বেরিয়ে আসতে হলো, খারাপই লাগল।

'ইস, সব সময়ই যদি আমাদের তদন্তটা হত সার্কাসে চোর ধরতে আসা, কি মজাই না হত তাহলে?' আফসোস করে বলল ফারিহা। 'কিশোর, কি মনে হয় তোমার? কালো-চুল লোকটাই চোর? দড়াবাজিকরদের মধ্যে তো একমাত্র ও-ই সন্দেহভাজন, তাই না?'

'হ্যাঁ,' চিঞ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'বাকি সবারই গোক আছে, কেবল ওই লোকটার বাদে। ওর সঙ্গে এখন কথা বলতে পারলে হত। মুখ ফসকে কোন সূত্র হয়তো দিয়েও ফেলতে পারে।'

'কিন্তু কথাটা শুরু করব কিভাবে ওর সঙ্গে?' ববের প্রশ্ন।

'শুরু সহজ। আমরা গিয়ে ওর অটোঘাস চাইব। মোটেও সন্দেহ করবে না সে।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল বব। কিশোরের বুদ্ধি তাকে অবাক করে। সমস্যার সমাধান যেন রেডি হয়ে থাকে ওর মগজে।

'দেখো দেখো,' ভুলি বলে উঠল, 'ওই লোকটা না? ওই যে, ভালুকের ট্রেনারের সঙ্গে কথা বলছে যে। হ্যাঁ, ওই লোকই। এখন কি চোরটার মত লাগছে ওকে?'

চোরের মত লাগছে কিনা এ জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'জলদি এসো! ওর সঙ্গে কথা বলার এইই সুযোগ। চোখ-কান খোলা রাখবে সবাই। কোন সূত্র যেন চোখ ডিয়ে না যায়।'

চোরের আস্তানা

প্রায় দৌড়ে এসে দড়াবাজিকরকে থিরে দাঁড়াল সবাই। চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল লোকটা। 'আরে, কি চাও তোমরা?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল সে। 'দড়ির ওপর কি করে হাঁটতে হয় শেখাব ইচ্ছে?'

'না।' খুব বিনীত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'আপনার অটোগ্রাফ, প্রীজ।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। রিঙের চেয়ে এখানে অনেক বেশি বয়স্ক লাগছে ওকে।

কিশোরের কথা শুনে হেসে উঠল লোকটা। লাল একটা ঝুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

'তাঁবুর ডেতরে সাংঘাতিক গরম,' বলল সে। 'অটোগ্রাফ? দাঁড়াও, দিছি। আগে এই ভয়াবহ জিনিসটা খুলে নিই। মগজ গলে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে।'

এক টানে পরচুলাটা খুলে আনল দড়াবাজিকর। মাথাটা পুরোপুরি টাক। ওরা তো হাঁ।

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি কাগজ আর কলম বের করে দিল কিশোর।  
যৌৎ-যৌৎ করতে করতে কাছে এসে দাঁড়াল এ সময় ভালুকছানাটা।

'ইস, কি সুন্দর!' চিঢ়কার করে উঠল ফারিহা। 'আমদের কাছেই এসেছে, তাই না? এই, আয়, আয়!'

সত্যি সত্যি ফারিহার কাছে চলে এল ছানাটা। তার পায়ে গা ঘৰতে শুরু করল। নিচু হয়ে ওটাকে তুলে নিতে গেল সে। বেজায় ভারী। আকার দেখে অটো মনে হয় না। গোমড়াযুখো একটা খুবক ছুটতে ছুটতে এল ওটার পেছনে। রুক্ষ ভঙ্গিতে রোমশ ঘাড়টা চেপে ধরল।

'আয়ি, শয়তান কোথাকার!' ঘাড় ধরে এমন করে বাঁকাতে শুরু করল ছানাটাকে, কুই কুই করে উঠল বেচারা।

'আহা, এমন করে মারছেন কেন?' প্রতিবাদ জানাল ফারিহা। 'এত সুন্দর ছানা। আমাদেরকে দেখতে এসেছিল। অপরাধ তো কিছু করেনি।'

লোকটার গায়ে ঢোলা গেঁজি। পরনে একটা ময়লা ঝানেলের ট্রাউজার। মাথায় খয়েরী কাপড়ের ক্যাপ।

ছানাটাকে নিয়ে চলে গেল লোকটা। কৌতুহলী হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এ-ও কি সার্কাসে কাজ করে নাকি? কই, রিঙে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'কেন, গল-পাওলাদের একজন,' গভীর মনোযোগে একের পর এক সই দিয়ে চলেছে দড়াবাজিকর। মনে হয় না ওর অটোগ্রাফ কেউ নিতে আসে। সে-জন্যে খুশি হয়েই দিচ্ছে। 'ওর নাম দ্বুরেক। জানোয়ারগুলোকে দেখাশোনা করাটা তার বাড়তি কাজ। এসো না কোন এক সময়, ভালুকের ঘীচার কাছে নিয়ে যাব। ভালুকগুলো ঘীচার মধ্যে কি করে দেখতে পারবে। বুড়ো হাতিটাও দু'একটা বাড়তি বনুরটি পেলে খুশি হবে। সঙে করে নিয়ে এসো, নিজের হাতেই খাওয়াতে পারবে। অত বড় শরীর হলে কি হবে, খুবই অস্ত্র!'

'সত্যি দেখাবেন?' ভালুকছানাটার কথা মনে করে কোন কিছু না ভেবেই বলে বসল ফারিহা, 'আসব। কালই চলে আসি, কি বলেন?'

'আসো। কাল সকালে,' দড়াবাজিকর বলল। 'এসে আমার খৌজ কোরো, আমি আশেপাশেই থাকব। আমার নাম রইস।'

তাকে ধন্বাদ দিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কেউ যখন আর ধারে কাছে রাখল না শোনার মত, ফারিহা বলল, 'ওই লোকটা চোর না হওয়াতে বরং খুশিই হয়েছি আমি। তবে পরচুলাটা যখন খুলে নিয়েছিল, চমকে গিয়েছিলাম।'

বোকা হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রাইল সবাই। লোকটার একেবারে চাঁদিতে হাতে গোণা করেকটা রেশমের মত বাদামী রোয়া বাদে চুল বলতে আর কিছুই নেই মাথায়। এ লোক চোর নয়। মুসা যে লোকটাকে দেখেছে, তার কালো চুল, চাঁদির সামান্য পেছনে ছোট গোল একটা টাক।

পরচুলাটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল মুসা। এমনও হতে পারে, এটা মাথায় দিয়েই হার চুরি করতে গিয়েছিল চোরটা। কিন্তু পরচুলার কোনখানে কোন রকম ফেকের দেখতে পেল না, যেটাকে টাক বলে মনে হয়। কিংবা কৃতিম টাকও বানানো নেই কোথাও। ঘন কালো চুলে ঢাকা পরচুলা।

'আমার পরচুলার খুব আগ্রহ মনে হচ্ছে তোমাদের?' হাসতে হাসতে বলল লোকটা। 'তোমরা বোধহয় জানো না, দড়াবাজিকরদের টাকমাথা হওয়া চলে না। দৈহিক যে কোন খুঁত দর্শকের কাছে যেন বীরিমত অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। সার্কাসের সব খেলোয়াড়কেই দেখা যেতে হবে যতটা সম্ভব অল্পবয়সী, চকচকে। নইলে কেন যেন যেনে' নিতে চায় না দর্শক। খুশি হয় না। হ্যাঁ, তোমাদের অটোগ্রাফ নেবে না?'

'আমিও,' কিশোর বলল। 'গাধা মনে হয়েছিল নিজেকে। রইসকে দেখে মনে হয়েছিল বোপের মধ্যে এই মুখই বুঝি দেখেছি। কিন্তু পরে যখন পরচুলাটা খুলে ফেলল, রীতিমত বোকা হয়ে গেলাম। বোপের মধ্যে বাকে দেখেছি রইসের চেয়ে তার বয়েসও অনেক কম।'

'চেহারার সূত্র দিয়ে আসলে ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, বোবা যাচ্ছে,' রবিন বলল। 'ভারচেয়ে ওর পোশাকের দিকেই বরং নজর দেয়া যাক। নীল পুলওভার, লাল সুতোর মিশ্রণ।'

'এটাও তেমন কোন সূত্র না,' অনিতা বলল। 'কত লোকেরই ওই রঙের পুলওভার আছে। ক'জনকে সন্দেহ করব?

'তুমি কোন বুদ্ধি দিতে পারো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

পারল না অনিতা। কেউই পারল না।

'তারমানে গেলাম আটকে আবার,' নিচের ঠোঁটে চিপতি কাটল কিশোর। 'রহস্যটা অস্ফুত। একবার মনে হয়, সমাধান হয়ে গেল বুঝি। পরক্ষণে দেবি, হয়নি। আগের জারিগাতেই রয়ে গেছি।'

'সার্কাসের মাঠে যাবে নাকি আবার কালকে,' অনিতা জিজ্ঞেস করল। 'চোরটাকে ধরতে অবশ্যই নয়। কারণ জেনেই তো গেলাম, সার্কাসের দড়াবাজিকর হারটা চুরি করেনি। যেতে চাই আসলে জানোয়ারগুলোকে দেখতে।'

'ঠিক,' ফারিহা বলল। 'ওই ভালুকের বাচ্চাটাকে দারুণ ভাল লাগে আমার। বুড়ো হাতিটাকেও আরও কাছে থেকে দেখব।'

'আমি যাব না,' মানা করে দিল ডলি। 'হাতি আমার ভীষণ ভয় লাগে। অন্তর্বড় জীব।'

'আমারও অসুবিধে আছে,' রবিন বলল। 'বব, তুমি কি করবে? যাবে? কাল না আমাদের স্ট্যাম্প জোগাড় করতে যাওয়ার কথা ছিলস্ব।'

'হ্যা, তাই যাব,' বব বলল। 'অকারণে আর সার্কাসের মাঠে গিয়ে লাভ কি? যা দেখার তো দেখেই এসেছি। ভালুক আর হাতির সঙ্গে খাতির জানোলার এক বিন্দু ইচ্ছে আমার নেই।'

'তাহলে আমরাই যাব,' কিশোর বলল। 'আমি, ফারিহা, মুসা আর অনিতা। তোমরা যে যেখানেই যাও, নীল পুলওভারের দিকে নজর রাখবে। চোখ খোলা রাখলে কখন যে কি চোখে পড়ে যাবে বলা যায় না।'

ঠিকই বলেছে কিশোর। তখনও জানে না সে, আগামী দিন কি জিনিস অবিকার করতে যাচ্ছে অনিতা।

## এগারো

পরদিন সকালে সার্কাসের মাঠে দেখা হলো কিশোর, মুসা, ফারিহা আর অনিতাৰ। টিটুকে সঙ্গে নেয়নি। কারণ গাহের মত মোটা গোড়ালিৰ চারপাশে ছেষ্ট কুকুরটাকে উক্তকে উক্তকে ঘূরঘূর করতে দেখলে নিশ্চয় পছন্দ করবে না বিশাল হাতিটো।

ফেলে রেখে আসাতে ভীষণ রেগে গেছে টিটু। বাড়িৰ বাইরে এসেও ওর খেউ খেউ কালে এসেছে কিশোরেৰ।

ফারিহাকে সে-কথা বলতে সে বলল, 'বেচারা টিটু! নিয়ে এলেই ভাল হত। কিন্তু অনেক জানোয়ারই তাকে পছন্দ করবে না। ভালুক, সিংহ, কেউ না। বেশি খুতখুতে তো, বোধহয় সে কৱণেই অন্য জানোয়ারেৱা দেখতে পাবে না ওকে।'

সার্কাসের মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে উক্ত করল ওরা। চারপাশে তাকিয়ে কৌতুহলী চোখে দেখছে সার্কাসের লোকজনকে। সাধারণ পোশাকে পুরোপুরি অন্য রকম লাগছে ওদের। রিঙের মধ্যে যতটা লাগে, এখন আতটা ভাল লাগছে না।

মাঠের মধ্যে আগুন জ্বলে কালো হয়ে যাওয়া পাত্রের মধ্যে রাখছে কেউ কেউ। বাতাসে ভেসে আসছে সুগন্ধ। নাক কুঁচকে বাতাস টানল মুসা। খিদে পেরে গেল তার।

রইসকে দেখতে পেল ওরা। কথা রেখেছে দড়াবাজিকর। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। হাতিটার সঙ্গে ওদের খাতির করিয়ে দিল সে। মনু হাঁক ছেড়ে ওদের স্বাগত জানাল ওটা। ওড়ে দিয়ে পেঁচিয়ে ফারিহাকে তুলে বসিয়ে দিল তার বিশাল মাথাটায়। চমকে গিয়ে চিন্তকার করে উঠল ফারিহা।

এরপর ছেষ্ট ভালুকটার খোঁজে চলল ওরা। ওদের দেখে ওটাও খুশি হলো। ঘীচার শিকের ফাঁক দিয়ে থাবা বাড়িয়ে ওদের হাত হেঁয়াৰ চেষ্টা করল। ঘীচার তালা খুলে ওকে বের করে আনল রইস। তার পা আঁকড়ে ধৰে পাশ দিয়ে মুখ বের করে কুঁতকুঁতে চোখে তাকাল ওদের দিকে। রীতিমত একটা খুন্দে ভাড়।

'ইস, ভারীটা যদি আবেকটু কম হত,' আফসোস করতে লাগল ফারিহা। ছানাটাকে তুলে কোলে নিতে ইচ্ছে করছে তার। 'যদি কিনতে পারতাম।'

'তাহলে আর টিটুকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যেত না,' কিশোর চোরের আস্তানা

বলল। 'মুরোমুখি হলৈই ঝগড়া বাধাত দুটোতে।'

এরপর ওদেরকে সিংহের খাচার কাছে নিয়ে গেল রইস। গোমড়ায়ুখে সেই যুবককে দেখা গেল খাচা পরিষ্কার করছে। সঙ্গে আরেকজন লোক। সিংহের ট্রেনার। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। গরগর করে উঠল একটা সিংহ।

তয় পেয়ে পিছিয়ে গেল ফারিহা।

'ভয় নেই,' ট্রেনার বলল। 'পেটে যতক্ষণ খাবার আছে, মেজাজ ভালই থাকে। তবে বেশি কাছে যেও না। সিংহ বলে কথা। বলা যায় না। ডুরেক, পানিটা বদলে দাও তো। য়ালা হয়ে গেছে।'

চারকোনা একটা বড় চিনের গাম্ভীর্য সিংহের খাবার পানি দেয়া হয়। বদলে দিল ডুরেক। সামান্যতম তয় পাছে না সিংহগুলোকে। কেয়ারই করছে না। গোমড়ায়ুখে বলে লোকটাকে পছন্দ হচ্ছে না ফারিহার, তবে সে যে দুঃসাহসী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাতে যেমন তাঁর থেকে বেরোতে ইচ্ছে করেনি, এখন তেমন সার্কাসের মাঠ থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না ওদের। কিন্তু কতক্ষণ আর। রইসকে গু-বাই জানিয়ে ফিরে চলল। যাওয়ার আগে ভালুকছানাটাকে আরেকবার চাপড়ে দিয়ে আদর করল ফারিহা। মাঠের ওপর দিয়ে কোনুকুনি হেঁটে বিশাল হাতিটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ওর মোটা পা চাপড়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল। ক্যারাভানগুলোর পাশ দিয়ে এগোল গেঁটের দিকে।

কাজে ব্যস্ত ক্যারাভানের বাসিন্দারা। য়ালা কাপড় ধুচ্ছে কেউ কেউ। কিছু কাপড় ঘাসের ওপর বিহিন্নে দিচ্ছে শুকানোর জন্যে। কিছু ঝুলিয়ে দিচ্ছে খুটিতে বাধা দড়িতে। বাতাসে উড়ছে সেগুলো। বাতাস বেশি বলে উড়ে যাওয়ার ভয়ে ক্লিপ লাগিয়ে দিতে হচ্ছে।

অলস ভঙ্গিতে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল গোয়েন্দারা। হঠাৎ দাঁড়িরে গেল অনিতা। দড়িতে বোলানো একটা জিনিসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উদ্বেজিত ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে।

'কি ব্যাপার?' জিজেস করল কিশোর। 'অমন লাল হয়ে যাচ্ছ কেন? কি হয়েছে?'

'আমাদের দিকে তাকিয়ে নেই তো কেউ?' কষ্টস্বর খাদে নামিয়ে বলল সে। 'দড়িতে বোলানো ওই মোজাওলো দেখছ?'

সবাই তাকাল দড়িটার দিকে। হেঁড়া ঝুমাল, বাচ্চাদের ঝুক, নানা রকম মোজা শুকাতে দেয়া হচ্ছে। নীল পুলওভারটা খুজতে লাগল কিশোরের চোখ।

কিন্তু বাতাসে উড়তে দেখল না কোন পুলওভার। কিসের ওপর নজর পড়েছে অনিতা? দৃষ্টি সরাতেই বুলো গেল কি দেখে উদ্বেজিত হয়ে উঠেছে অনিতা।

নীল উলের একজোড়া মোজার দিকে তাকিয়ে আছে সে। প্রতিটি সুতোয় একপাই করে লাল সুতো মেশানো। দেয়ালে আটকে থাকা উলের সুতোটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। মিল আছে।

নোটবুক থেকে সুতোটা বের করে এনে মোজার সুতোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। নীল রঞ্জটা অবিকল এক। লালটাও এক। উলটাও একই ধরনের।

'আর এই যে দেখে?' ফিসফিস করে বলল অনিতা, 'কেমন কুঁচকে রয়েছে। টান লেগে সুতো ছিঁড়ে গেলে যেমন হয়ে যায়। সুতো যে ছেড়া বোঝাই যাচ্ছে। তারমানে তোমার হাতের সুতোটা এ মোজাটা থেকেই ছিঁড়েছিল।'

কিশোরও একমত হলো।

এক বৃক্ষ মহিলা এসে থেই থেই করে উঠল, 'অ্যাই অ্যাই, মোজায় হাত দিছ কেন? চুরি করার ইচ্ছে নাকি?'

ভয়ানক বৃক্ষ! মোজাটা কার, তাকে জিজেস করার সাহসই হলো না কিশোরের। করলে হয়তো ওই মুহূর্তেই জেনে নেয়া যেত, চোরটা কে।

## বারো

অনিতাকে ধাক্কা মারল বৃক্ষ। 'অ্যাই, কথা কানে যাচ্ছে না? সরো! যাও এখান থেকে!'

আর দেরি করল না ওরা। তাড়াতাড়ি সরে এল ওখান থেকে।

'বাপের বাপ! ডাইনী!' মুসা বলে উঠল।

'ইস, ফগ থাকলে এখন ভাল হত,' অনিতা বলল। 'বৃক্ষের সাথে টকরাটা কি রকম লাগে দেখা যেত।'

মাঠে থাকতে মোজাটার কথা তুলল না কেউ। কে কোনখান থেকে শুনে কেলে এই ভয়ে। কিন্তু মাঠের বাইরে এসেই একসঙ্গে ফেটে পড়ল যেন সবাই।

'মোজার কথা কলনাই করিনি আমরা! আমরা তো ছিলাম পুলওভারের খোজে!'

'কিন্তু ওই মোজাটা থেকেই যে দেয়ালে সুতো ছিঁড়ে আটকে ছিল তাতে কোন

সন্দেহ নেই!

'মোজাটা কার যদি জানা যেত! কার জিমিস জানা গেলে ধরে ফেলত পারতাম চোরটাকে। আচ্ছা, কি হত বুড়িটাকে জিজ্ঞেস করলে? খেয়ে তো আর ফেলত না!'

'খেয়েই ফেলত! যা বুড়ির বুড়ি!'

প্রায় ছুটতে ছুটতে কিশোরদের ছাউনিতে এসে ঢুকল ওরা। এরপর কি করা যায় আলোচনা করার জন্যে। সেখানে বসে থাকতে দেখল রবিন, ডলি আর ববকে। কিশোরা কি করেছে সেটা শোনার অপেক্ষা করল না, নিজেরা কি করেছে বলা প্রশ্ন করল।

'কতগুলো গোল গোল দাগ দেখেছিলাম না ওয়্যালন ফেন্টের দেয়ালের কাছে?' বলে উঠল রবিন। 'ওই জিমিস দেখে এসেছি আবার!'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পুরালো চিমনি কটেজটার কাছের নরম মাটিতে,' রবিন জানাল। 'আমি আর বব দেখলাম। দেখেই ছুটলাম ডলিকে জানাতে। তারপর, তাকে নিয়ে এখানে এলাম তোমাদের বলতে। কিসের দাগ, বের করে ফেলেছে ডলি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যা, কঠানাই করতে পারবে না,' ডলি বলল।

'কিসের দাগ? জলদি বলো!' মোজার কথা ভুলেই গেল ফারিহা।

'গোল গোল দাগগুলো দেখে প্রথমে বুঝতে পারিনি কিসের, ওই সেদিনকার মত,' ডলি বলল। 'তারপর কটেজে কে বাস করে মনে পড়তেই বুঝে ফেললাম সব।'

'কে বাস করে?' জানার জন্যে তর সহিতে না কিশোরের।

'কেন, জানো না? অ, তুমি তো এখানে থাকো না, না জানাবই কথা। ওখানে থাকে বোঢ়া রোজার। একটা পা হাঙ্গের কামড়ে কেটে ফেলেছিল। ওটাতে কাঠের পা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। মাথায় গোল লোহার নিশ পরানো। ওটার সাহায্যে অঙ্গুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে হাঁটে রোজার।'

সবারই মনে হলো, তাই তো! ঠিকই বলছে ডলি।

কিন্তু কিশোর মেনে নিতে পারল না। মাথা মাড়ল। 'উহ, বোঢ়া রোজার হওয়ার সম্ভাবনা কর। এক পা নিয়ে এত উচ্চ দেয়াল সে টপকাতে পারবে না। তা ছাড়া চোরটা এক জোড়া মোজা পরে, তারমানে আর দুটো পা।'

'কি করে জানলে ও মোজা পরে?' হাঁ হয়ে গেল ডলি।

সার্কাসে গিয়ে কি জিনিস আবিষ্কার করে এসেছে, জানানো হলো ডলি, বব আর রবিনকে।

নিজের সিন্ধান্তে অটল রইল ডলি। 'বেশ, মেনে নিলাম বোঢ়া রোজার দেয়াল টপকাতে পারবে না। কিন্তু আসল চোরটাকে চূরি করতে সাহায্যও করতে পারবে না, তা তো নয়। দাগগুলো অবিকল এক। তারমানে দেয়ালের কাছে গিয়েছিল বোঢ়া রোজারই। ও ওখানে কি করছিল?'

ডলির কথায় যুক্তি আছে বুঝে মাথা ঝাকাল কিশোর। 'সেটাই এখন বের করতে হবে আমাদের। ওকে দিয়ে দাগগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা দরকার।...নতুন নতুন মোড় নিচে খালি কেসটা। কে ভাবতে পেরেছিল এক পাওয়ালা একটা বোঢ়া লোক গিয়েছিল দেয়ালের কাছে।'

তখনই চিমনি কটেজে রওনা হলো ওরা। বাড়িটার সামনে বেশ খানিকটা জায়গায় নরম মাটি। তাতে গোল দাগের ছাড়াছাড়ি। ঝুঁকে বসে ভাল করে দেখতে লাগল কিশোর।

লোটরুক থেকে সুতোর টুকরোটা বের করে নিল, গোল দাগের মাপ নিয়েছিল যেটা দিয়ে। মেপে দেখে আবাক হয়ে যুধ তুলল, 'উহ, মাপে মিলছে না। এক দাগ নয়। এগুলো ইঞ্জিনের ছাট।'

'আশ্চর্য!' বব বলল। 'বোঢ়া রোজার ছাড়াও তাহলে কাঠের পাওয়ালা আরও একজন লোক আছে এই এলাকায়!'

সবাই ভাবতে লাগল। কিন্তু কাঠের পাওয়ালা হিতীয় কোন মানুষের কথা মনে করতে পারল না।

'এখানে তো কিছু হলো না, আবার সেই সার্কাসের দিকেই নজর দিতে হচ্ছে,' কিশোর বলল অবশ্যে। 'সেখানে অন্তত জোরাল একটা সূত্র রয়েছে। মোজাগুলোর মালিককে খুঁজে বের করতে হবে। তাহলেই পাওয়া যাবে চোরের সন্ধান।'

'কি করে বের করবে?' মুসার প্রশ্ন। 'বুড়িকে জিজ্ঞেস করবে?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'করলেও জবাব দেবে না বুড়ি। আবার দূর দূর করে খেদাবে। নজর রাখব আমরা। মোজাগুলো কে পায়ে দেয় দেখব।'

'যদিও কঠিন হবে কাজটা,' রবিন বলল, 'তবে আমারও মনে হয় এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'ঠিক আছে তাহলে,' কিশোর বলল। 'কাল সকাল ঠিক দশটায় চলে এসে সবাই সার্কাসের মাঠে।'

চোরের আস্তানা

## তেরো

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় সার্কাসের মাঠে হাজির হয়ে গেল সবাই। আবার দড়াবাজিকর রইসের সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করল ওরা। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

‘শহরে চলে গেছে,’ জানাল আরেকজন দড়াবাজিকর। ‘তাকে কি দরকার তোমাদের?’

‘না, এমনি।’ জবাব দিল কিশোর। ‘তাকে জিজেস করতাম...মানে, অনুমতি নিভায় আরকি তার কাছ থেকে—সার্কাসে ঘুরে বেড়াতে পারব কিনা আমরা। জন্ম-জানোয়ারগুলোর প্রতি আমাদের খুব আগ্রহ।’

‘দেখোগে, অস্বিধে নেই,’ রইসের হয়ে অনুমতি দিয়ে দিল লোকটা। এগিয়ে গেল তার ক্যারাভানের দিকে। মজার ব্যাপার হলো, পায়ে হেঁটে নয়, চার হাত-পায়ের সাহায্যে ঘূরতে ঘূরতে গেল সে পুরোটা পথ।

‘এ ভাবে ঘোরে কি করে ওরা? অনিতা বলল। ‘ঠিক যেন একটা চাকা।’

‘দেখো না চেষ্টা করে, পারো নাকি,’ হেসে বলল বৰ।

সত্ত্বই করে দেখতে গেল অনিতা। কিন্তু হাতের ওপর তুর রাখার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল কুকড়ে-বুকড়ে। ঘাসের ওপর পড়ে রইল হাত-পা ছড়িয়ে।

হাসতে লাগল সবাই।

এগিয়ে এল একটা ছেষ্টি মেয়ে, ফারিহার সমবয়েসী হবে। অনিতার অবস্থা দেখে হাসল। হাত-পা ছড়িয়ে চাকার মত ঘূরতে শুরু করল মাঠের ওপর। যেন কিছুই না ব্যাপারটা।

‘কাও দেখলে! বৰ বলল। ‘সার্কাসের একটা ছেষ্টি মেয়েও পারে। নিশ্চয় এ সব ওদের হোমওঅর্ক।’

এরপর ভালুকছানাটাকে দেখতে গেল ওরা। কিন্তু ঘুমিয়ে আছে ওটা। সারধানে এগোল তখন কাপড় বোদে দেয়ার দড়িগুলোর দিকে। মোজাগুলো নেই আজ। যার জিমিস সে হয়তো পরে আছে এখন।

তার সকানে সারা মাঠে ঘূরতে লাগল গোয়েন্দারা। লোকের গোড়ালির দিকে নজর। কিন্তু বড়ই হতাশ হতে হলো, যখন দেখল সবার পা-ই খালি, কারণ পায়ে

মোজা নেই।

সিংহের খাচার কাছে গিয়ে দরজার তালা খুলতে দেখা গেল ভুরেককে। তেতরে গিয়ে ধোয়াধুয়ি শুরু করল। সিংহগুলোর দিকে তাকালও না। সিংহগুলোও নজর দিল না ওর দিকে। এটা একটা সৃংঘাতিক ব্যাপার বলে মনে হলো ফারিহার কাছে। সিংহের থাবার কাছে অনবন্ত শ্বেরাধুরি করছে, অথচ ওকে কিছু বলছে না ওরা।

ফ্লানেলের ট্রাউজারটা গুটিয়ে হাঁটুর কাছে ভুলে দিয়েছে সে। মোঝা, ময়লা পা। মোজা নেই। আছে কেবল এক জোড়া রবারের পাঞ্চ শু। মাথার ক্যাপের সামনের দিকটা কপালের ওপর টেনে বসিয়ে দিয়েছে, যাতে খুলে না পড়ে।

খানিকক্ষণ ওর কাজকর্ম দেখে যাওয়ার জন্যে ঘূরল ছেলেমেয়েরা। আর একজন লোককে আসতে দেখল এদিকে। তার গোড়ালির দিকেও তাকাল ওরা মোজা নেই। সার্কাসের বাকি সবার মত এর পা-ও খালি।

তবে একটা জিমিস দৃষ্টি আকর্ষণ করল রবিনের। থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে।

জুকুটি করল লোকটা। ‘কি ‘দেখছু?’ বিব্রত বোধ করছে সে। ‘এ ভাবে তাকিয়ে আছ কেন আমার দিকে?’

তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল রবিন। বন্ধুদের দিকে তাকাল। উদ্রেজনায় লাল হয়ে গেছে মুখ। কিশোরের হাত ধরে টেনে সরিয়ে আনল খানিকটা। সবাই এল ওদের সঙ্গে।

সরে এসে, লোকটা ধাতে খুলতে না পায় এমন করে বলল সে, ‘ওর কোটটা দেখেছু? গাছের ওপর যে ক্যাপটা পেয়েছি, কাপড়টা ঠিক সেটার মত না? তবে ওটার মত যায়লা নয়। নাকি?’

সাত জোড়া চোখ ঘুরে গেল লোকটার দিকে। সিংহের খাচার বাইরে দাঁড়িয়ে শিকগুলোতে রঙ করতে শুরু করেছে লোকটা। সব সময় সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন করে রাখা হব জন্ম-জানোয়ারের খাচাগুলো। কোটটা খুলে ঝুলিয়ে রেখেছে খাচার কোনায়। কাছে গিয়ে ক্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল গোয়েন্দারা।

‘ক্যাপটা আছে তোমার সঙ্গে?’ ফিসফিস করে জিজেস করল অনিতা।

মাথা বাকিয়ে মিজের কোটের পক্কেট চাপড়াল কিশোর। তদন্ত করতে এসেছে। সমস্ত সৃত্বই নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে।

হঠাৎ করেই এসে গেল সুযোগ। কে যেন চিৎকার করে ভাকতে লাগল।

চোরের আস্তমা

সাড়া দিয়ে কথা বলতে চলে গেল লোকটা। খাচার কাছে ফেলে গেল তার রঙের ব্রাশ, টিন আর কোটটা। এক মুহূর্ত দেরি না করে কোটের কাছে উঠল ওরা।

'সিংহ দেখার ভান করতে থাকো,' নিচুরে সবাইকে বলল কিশোর।

খাচার দিকে তাকিয়ে সিংহগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল সবাই, সে পকেট থেকে ক্যাপটা বের করে কোটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেল।

কোটের গায়ে চেপে ধরল ক্যাপটা, অবিকল এক নিচয় একই দর্জির কাছ থেকে একই কাপড় দিয়ে বানানো হয়েছে দুটো জিনিস। এর মানে কি? এই লোকটাই চোর? কিন্তু ক্যাপ ফেলে এল কেন গাছের ভালে? মাথায়ও কিছুই বুঝতে পারল না কিশোর।

শিস দিতে দিতে ফিরে এল লোকটা। ব্রাশ তুলে নিয়ে আবার রঙ করতে শুরু করল। বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঠ হয়ে লোকটার চাঁদিটা দেখার চেষ্টা করল মুসা।

আর কিছু দেখার নেই। খাচার কাছ থেকে সরে এল ওরা। লোকটা যাতে শুনতে না পায় এতটা দূরে সরে এসে কিশোর জানাল, 'হ্যাঁ, ক্যাপের সঙ্গে কোটের মিল আছে। এ লোকটা সন্দেহজনক। নজর রাখা দরকার।'

'কোন লাভ নেই,' হতাপ ডিঙিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'ওর চাঁদি দেখে এলাম। চুল কালো ঠিকই, কিন্তু টাক নেই। আমার সঙ্গে গাছে বসে থাকা লোকটা ও নয়। চোর নয় ও।'

## চোল্দ

সার্কাসের মাঠ ঘিরে যে লোহার রেলিঙ্গের বেড়া হয়েছে, তার মাথায় চড়ে বসল গোয়েন্দরা।

কিশোর বাদে বাকি সবাই হতাপ।

'ভাবো দেখি অবস্থাটা,' রবিন বলল। 'ক্যাপের সঙ্গে মিল আছে লোকটার কোটে। কিন্তু চাঁদিতে টাক নেই।' গুণ্ডিয়ে উঠল সে। 'অন্তু এক রহস্য নিয়ে পড়েছি আমরা। নানা ধরনের সূত্র পাছি, যেগুলো অনেক ভাবেই মিলছে, অথচ সামান্যতম এগোতে পারছি না আমরা।'

'এখন তো মনে হচ্ছে,' তার সঙ্গে সুর মেলাল ফারিহা, 'মোজা পায়ে পরা

কোন লোককে খুঁজে পেলেও দেখা যাবে সে চোর নয়। হয়তো চোরের ভাই, কিংবা খালা কিংবা অন্য কিছু।'

হেসে উঠল সবাই। তবে তিক্ত হাসি।

কিশোর বলল, 'যাই হোক, আমরা এখনও শিওর না, ক্যাপটার সঙ্গে চোরের আসলেই কোন সম্পর্ক আছে কিনা। চুরিটা যেখানে হয়েছে, তার কাছাকাছি পেয়েছি বলেই সন্দেহটা হচ্ছে।'

'য়া-ই বলো,' বব বলল, 'আমার বিশ্বাস ক্যাপের সঙ্গে চোরের সম্পর্ক নিষ্ঠয় আছে। নইলে ওটা ওখানে যাবে কেন?'

'সেই কেনটা জানতে পারলে অনেক প্রশ্নের জবাবই পেয়ে যেতাম।'

রেলিঙ্গের ওপর বসে চিত্তিত মাটিটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। সবারাই মনে হচ্ছে, রহস্যটা মাথা গুলিয়ে দেয়ার যত। হঠাতে করেই হোট একটা চিন্কার বেরিয়ে এল ফারিহার মুখ থেকে।

'কি ব্যাপার? কি হলো? কোন কিছু মনে পড়েছে নাকি?' জিজেস করল কিশোর।

'না। একটা জিনিস দেখতে পাইছি,' হাত তুলে ভানে দেখাল ফারিহা। সবাই ফিরে তাকাল। ফারিহার যত চিন্কার বেরিয়ে এল কারণ কারণ মুখ থেকে। হাঁ হয়ে গেছে সবাই।

মাঠের ওইখানটা ভেজা ভেজা। নরম মাটিতে দেখা গেল রহস্যময় সেই গোল গোল দাগ। খোড়া রোজারের বাঢ়ির কাছে যে রকম দাগ দেখেছে, সে-রকম।

'এগুলোই মনে হচ্ছে ঠিক সাইজ,' বলে লাফ দিয়ে সেমে গেল কিশোর। 'খোড়া রোজারের দাগগুলোর চেয়ে বড়, দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পকেট থেকে সুতোটা বের করে মাপল। কয়েকটা দাগ মেপে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মুখ তুলে তাকাল। মুখে উজ্জ্বল হাসি।

'হ্যাঁ, মিলে গেছে। দেয়ালের কাছে যে দাগগুলো দেখেছিলাম, সেগুলো আর এগুলো অবিকল এক।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'তারমানে সার্কাসেও একজন খোড়া লোক আছে? সে চোর হতে পারে না, কারণ এক পা নিয়ে দেয়ালে চড়তে পারবে না। তবে চোরের সামরণেদ হতে পারে।'

'খুঁজে বের করা সরকার ওকে,' বব বলল। 'ওকে বের করে তার বক্সটি কে জেনে নিতে পারলেই পেরে যাব আমাদের চোরটাকে। এবং আমার বিশ্বাস, চোরের আস্তানা

চোরের পায়েই মোজগুলো দেখতে পাব আমরা। যাক, এগোতে শুরু করেছি এতক্ষণে।'

খানিক দূরে সার্কাসের সেই ছেষটি মেয়েটাকে ঘূরমূর করতে দেখে তাক দিল কিশোর। 'অ্যাই, শুনে যাও।' সে কাছে এলে বলল, 'সার্কাসের খোড়া লোকটার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা। কোন ক্যারাভানে থাকে?'

'বোকা নাকি,' মেয়েটা জবাব দিল। 'ন্যাংড়া মানুষ সার্কাসের কোন কাজে আসবে? এখানে যারা আছি আমরা, সবারই দুটো করে পা। হাত-পা সব ঠিক না থাকলে সার্কাসে খেলা দেখানো যায় না।'

'দেখো,' জোর দিয়ে বলল কিশোর, 'আমরা জানি, খোড়া একটা লোক আছেই এখানে।' পকেট থেকে একমুঠো লজেস বের করে দিল মেয়েটাকে। 'নাও। এবার বলো, লোকটাকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

থাবা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে লজেসগুলো প্রায় কেড়ে নিল মেয়েটা। একসঙ্গে মুখে পুরে দিল গোটা ভিনেক। চুবতে চুবতে বলল, 'খামোকাই দিলে। তোমরা পাগল। এখানে এক পাওয়ালা কোন লোক থাকে না।'

আর কোন প্রশ্ন করার আগেই সেখান থেকে চলে গেল মেয়েটা। বাকি লজেসগুলো পকেটে রেখে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে ঢাকার মত ঘূরে ঘূরে। এ ভাবে চললে ইটার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি চলা যায়।

'গিয়ে যানি ধরে চাবকাওও এখন ওকে,' কাছের একটা ক্যারাভান থেকে বলে উঠল এক মহিলা, 'তাহলেও কোন লাভ নেই। খোড়া লোকের খোজ দিতে পারবে না ও। কারণ এ সার্কাসে কোন খোড়া লোক নেই।'

ভেতরে চুকে দরজা দাগিয়ে দিল মহিলা।

হাবা হয়ে গেল আবার গোয়েন্দ্বাৰা।

'কপলাটাই খারাপ আমাদের! সে-জন্যেই এগোতে এগোতে এগোতে পারছি না,' রবিন বলল। 'চিমনি কটেজের কাছে গিয়ে গোল দাগ দেখে ভাৰুলাম চোৱ ওখানে থাকে। মাপে মিলল না। এখানে দাগগুলো মাপে মিলল। কিন্তু খোড়া কোন লোকই থাকে না। আর কত অবাক হব!'

'আত হতাশ হওয়ার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'দাগগুলো অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে।'

নৰম মাটিতে দাগ স্পষ্ট। মাটি যেখানে শক্ত, সেখানে দাগ অতটা না বসলেও ঘাসের গায়ে যেটুকু বসেছে সেটা দেখেই অনুসরণ করা গেল। দাগগুলো গিয়ে শেষ হয়েছে সিংহের খাচার কাছ থেকে সামান্য দূরে রাখা ছেষটি একটা

ক্যারাভানের কাছে। পাশের আরেকটা ক্যারাভানের সিডিতে বসে থাকতে দেখা গেল ভুরেককে। ওদের এ ভাবে এগোতে দেখে অবাক হলো সে।

দাগ শেষ হয়েছে যেটার কাছে, সে-ক্যারাভানটার সিডিতে উঠে ভেতরে উকি দিল কিশোর। সার্কাসের মালপত্রে বোঝাই। কেউ থাকে বলে মনে হলো না।

ঠক করে ওদের কাছে এসে পড়ল একটা ইটের তুকরো। আরেকটা এসে লাগল ববের পায়ে। চিংকার করে উঠল ভুরেক, 'ওখানে উকি মারছ কেন? চুরি কৰার ইচ্ছে?' হাত বাড়িয়ে আরেকটা ইটের তুকরো তুলে নিল সে। 'যাও এখান থেকে জলন্দি! নইলে মাথায় মারব বলে দিলাম!'

## পনেরো

ওখান থেকে দ্রুত সরে এল ওরা। মাটেই থাকল না আৰ। রাস্তায় বেরিয়ে এল। গোড়লি ভুলতে লাগল বৰ। যেখানে তিলটা লেগেছে ব্যথা করছে।

'জানোয়ার কোথাকার!' গজগজ করতে লাগল সে। 'দেখতে দিল না কেন আমাদের? কি লুকিয়ে রেখেছে?'

'নিচয় চোরাই মাল,' হেসে বসিকতা কৰল ফরিহা। 'মৃত্যুর হার।'

ঙ্গির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ভুড়ি বাজিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। হাসিৰ ব্যাপার নয়। মুজোটা এই সার্কাসেরই কোনখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নইলে এত রেগে উঠল কেন ভুরেক?'

'ক্যারাভানটায় তুকে দেখতে পারলে হত,' মুসা বলল। 'কিন্তু কি ভাবে তুকব?'

'তুকল!' কিশোর বলল। 'ৱাতে আসব আবার। সার্কাস যখন চলে। সবাই থাকবে সার্কাসের তাঁবুতে ব্যস্ত। এই সুযোগে তুকে পড়ব আমরা।'

'কিন্তু এ রকম একটা জায়গায় এত দামী একটা জিনিস রাখবে?' সন্দেহ হচ্ছে অনিতার।

'চোরাই মাল যখন, যেখানে খুশি রাখতে পারে, কারও চোখে না পড়লেই হলো,' জবাব দিল কিশোর। 'গোল দাগগুলো ওই ক্যারাভানটার কাছেই গিয়ে শেষ হয়েছে। কাজেই ওটাতেই আগে খোজা দৰকার।'

'তা ঠিক,' একমত হলো ডলি। 'খোড়া লোকটার কেঠো পায়ের দাগ, যে

লোকটাকে দেখিইনি আমরা কথনও। তাকে পাওয়া যাবে কোথায়?’

‘আরেকটা রহস্য,’ বর বলল। ‘তবে দাগ যখন পাওয়া গেছে তাকেও পাওয়া যাবে। পুরো ব্যাপারটাকেই একটা জটিল ধীধার মত লাগছে আমার কাছে। তবে আমি জানি, খাপে খাপে যখন বসে যাবে, পানির মত সহজ হবে যাবে সব কিছু।’

‘জানলে তো পানির মতই সহজ হয়,’ অনিতা বলল, ‘কিন্তু বুঝতেই তো পারছি না কি করে বসাব। দড়ির মধ্যে শুলতে দেখলাম এক জোড়া মোজা, ক্যাপের সঙ্গে মিলে যাওয়া একটা কোট। কোটের মালিককে দেখলাম, সার্কাসের মাঠে খুঁজে পেলাম অসংখ্য গোল দাগ। অথচ কোনটাই তো কোনটার সঙ্গে মিশ যাচ্ছে না।’

‘চলো, বাড়ি যাই,’ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। ‘যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সারাটা সকালই তো কাটিয়ে দিলাম এখানে। কিছুই করতে পারলাম না। এ কেসের সমাধান আদৌ করতে পারা যাবে কিনা বুঝতে পারছি না। দাগগুলো অনুসৃত করে এসেও চোরের দেখা পাওয়া গেল না।’

‘আজকে আর কোন মীটিং নেই,’ রাজা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর। ‘আজ রাতেও সার্কাসে যাচ্ছি আমরা। তবে শুধু আমি আর মুসা যাব। সবার যাবার দরকার নেই। মুসা, একটা টর্চ নিয়ে আসবে। হারটা ক্যারাভানে থাকলে আলো ছাড়া দেখতে পাব না।’

‘তা আনব,’ মুসা বলল। ‘তবে হার পাওয়ার ব্যাপারে মোটেও আশাবাদী নই আমি।’

রাতে সার্কাসে আগে পৌছল মুসা। তার ফিনিটখানেক পরে ছুটতে ছুটতে এল কিশোর। দুটো টিকেট কেটে আলন সে। সার্কাসে ঢুকল দু'জনে।

‘অর্ধেকটা দেখব,’ ফিসফিস করে বলল সে। ‘সার্কাস যখন জমে উঠবে, আস্তে করে বেরিয়ে চলে যাব।’

পেছনের একটা সুবিধাজনক জায়গায় এসে বসল ওরা, যাতে সহজে বেরিয়ে পারে। শো শুরু হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল।

আগের দিনের চেয়েও এদিন খেলাগুলো ভাল লাগছে ওদের কাছে। ভাঙ্ডেরা এল, দড়াবাজিকরেরা এল, এল রন-পাওয়ালারা। পুরো শোটা না দেখে বেরিয়ে হলো বলে দুঃখই লাগল ওদের।

মাঠটা অঙ্ককার। কোন দিকে যাবে, দিক ঠিক করতে সময় লাগল ওদের।

‘ওদিকে,’ মুসার হাত ধরে টানল কিশোর। ‘মনে হচ্ছে ওই ক্যারাভানটা।’

সারধানে ক্যারাভানের দিকে এগোল ওরা। টর্চ জ্বালতে সাহস করল না কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে। ক্যারাভানের কাছে এসে সিঁড়িতে হোচ্চ খেল কিশোর। সামলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

‘এসো, দাঁড়িয়ে আছ কেন?’ ফিসফিস করে মুসাকে বলল সে।  
কেড নেই। দরজার তালাও নেই। ভেতরে ঢুকে পড়ল দু'জনে।

অঙ্ককারে কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগল মুসা। জিঞ্জেস করল, টর্চ জ্বালব?’  
‘জ্বালো। কারও সাড়াশব্দ তো শোনা যাচ্ছে না।’ টর্চের মুখে হাত চাপা দিয়ে আলো জ্বাল কিশোর। রশ্মিটা সরাসরি বেরিয়ে দিল না। হাতের ফাঁক দিয়ে ঘেটুকু আভা বেরিয়ে সেই আলোয় দেখার চেষ্টা করল।

মুখ কুঁচকাল বিরতিতে। ভুল ক্যারাভানে ঢুকেছে। মালপত্রে তরা হোট ক্যারাভানটা নয়, ঢুকেছে আরও বড় একটা ক্যারাভানে, যেটাতে লোক বাস করে। এখুনি বেরিয়ে যাওয়া দরকার। ধরা পড়ার আগেই।

কিন্তু কপাল খারাপ। বাইরে মানুষের গলা শোনা গেল। কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। সিঁড়িতে পা রাখার শব্দ হলো। কি করবে শুরা? কোথায় লুকাবে?

## ৰোলো

‘জলদি! তুমি ওই বাক্ষটার নিচে পিয়ে ঢোকো।’ ফিসফিস করে বলল কিশোর। ‘আমি এটাতে ঢুকছি।’

হামাঙ্গি দিয়ে ঢুকে পড়ল দু'জনে। বিছানার চাদরটা অনেকখানি বেরিয়ে ঝুলে রয়েছে। আড়াল করে রাখবে ওদের।

দু'জন লোক ঢুকল ক্যারাভানে। একজন হ্যারিকেন ধরাল। দুটো বাকে মুখোমুখি বসল দু'জনে। ওদের পা ছাড়া আর কোন কিছুই নজরে আসছে না কিশোরের।

হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল সে। ওপাশের বাক্ষটায় যে লোকটা বসেছে, পা চুলকানোর জন্যে প্যান্টের নিচের দিকটা উঁচু করল সে। তার পায়ে নীল রঙের মোজা। উলঙ্গলোতে এক গাছি করে লাল সুতো মেশানো।

কয়েক হাতের মধ্যেই রয়েছে তোরটা, অথচ মুখ দেখতে পাচ্ছে না! দুর্ভাগ্য

একেই বলে। ভাবছে কিশোর।

‘আজ রাতেই কেটে পড়ি আমি,’ একজন বলল। ‘সার্কাস মোটেও ভাস্তাগছে না আমার। পচা পচা সব শো। সারাঙ্গল লোকগুলো করে ঝগড়াবাটি। পুলিশের ভয় তো আছেই। কোন সময় যে এসে হাজির হবে খোদাই জানে!'

‘আকারণে এত ভয় পাচ্ছ তুমি,’ বিবরণ কর্তে বলল মোজা পরা লোকটা। ‘পরিষ্ঠিতি আগে খানিকটা ঠাণ্ডাতুষা হোক। কবে বের করে দিতে হবে জানিও। যেখানে আছে নিরাপদেই আছে। মাসের পর মাস পড়ে থাকলেও অসুবিধে হবে না।’

‘সত্যি কি হবে না?’

‘না, হবে না,’ হেসে উঠল মোজা পরা লোকটা। অস্তুত একটা কথা বলল, ‘সিংহেরাই পাহারা দেবে।’

কান পেতে তখনে মুসা আর কিশোর। বিশ্বাস। তীব্র। চোরটা এখানেই আছে—মোজা পরা লোকটা, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার চেহারাটা কেনমতেই দেখার উপায় নেই। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার, আপাতত হারটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সে। পরিষ্ঠিতি স্বাভাবিক হলে বের করবে। আর দ্বিতীয় লোকটা ভয় পেয়ে চলে যেতে চাইছে।

‘তৃতীয় ওদের বোলো,’ প্রথম লোকটা বলল, ‘ইঠাঁৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আজ আর রিঙে যেতে পারব না আমি। কালকে আমাকে না দেখে কিছু জিজেস করলে, যা হোক বানিয়ে বলে দিও একটা কিছু।’ এক মুহূর্ত থায়ল লোকটা। তারপর বলল, ‘ভালৈ আমি এখন যাই। সবাই এখন রিঙে। কেটে পড়ার এইই সুযোগ। ঘোড়টা লাগিয়ে দিয়ে যাবে, প্রীজ?’

মোজা পরা লোকটা উঠে দাঁড়াল। নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। মনে প্রাণে চাইছে মুসা আর কিশোর, অন্য লোকটাও উঠে চলে যাক। তাহলে ওরাও বেরোনোর সুযোগ পাবে। কিন্তু গেল না লোকটা। যেখানে ছিল সেখানে বসেই আঙুল দিয়ে টাঁটু বাজাতে লাগল বিছানার ওপর। বোৰা যাবে ভয়ের কারণে অস্থিতিতে ভগছে।

ক্যারাভানের জোয়ালের মত জিনিসটায় ঘোড়া ভুতার শব্দ হলো। সিঁড়িতে দেখা দিল প্রথম লোকটা। ‘নাও, হয়েছে। চলে যাও এখন। পরে দেখা করব।’

বাস্ত থেকে উঠে দ্বিতীয় লোকটাও বেরিয়ে গেল। দুই গোয়েন্দাকে চমকে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। ঘুরে চলে গেল সামনের দিকে। ভ্রাইভিং সীটে উঠে বসল। জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে টান দিল ঘোড়ার লাগাম

ধরে। মাঠের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করল ঘোড়টা।

বাকের নিচ থেকে বেরিয়ে এল মুসা। মহা বিরক্তিতে মুখ বাকাল। ‘ভাল! দরজায় তালা। বেরোব কি করে?’

‘বুবতে পারছি না।’ বাকের নিচের অস্থিতিকর জায়গাটা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোতে শুরু করল কিশোরও। ‘একটা জিনিস লক্ষ করেছ, একজনের পায়ে নীল মোজা ছিল? ওই লোকটাই চোর।’

‘আমের কিছুই জানা হলো আজ,’ জবাব দিল মুসা। সে-ও বেরিয়ে এল হামাগুড়ি দিয়ে। ‘এখন আমরা জানি, সার্কাসেরাই কোনখানে লুকানো রয়েছে হারটা। সিংহেরাই পাহারা দেবে বলে কি বোবাতে চাইল লোকটা?’

‘সিংহেরা পাহারা দিতে পারবে কোনখানে থাকলে? ওদের খাচায়। কিন্তু ওখানে লুকানোর জায়গা কোথায়? লোহার শিক ছাড়া তো আর কিছু নেই। তোমার কি মনে হয় কোন ফাপা শিকটিক আছে?’

‘উহ,’ জবাব দিল মুসা। ‘কোথায় রেখেছে পরে দেখব। এখন এখান থেকে বেরোনো দরকার। জানালা দিয়ে চেষ্টা করে দেখব নাকি?’

বড় জানালাটা সামনের দিকে। সেটার কাছে এসে উকি দিল দু'জনে। বাইরে তাকিয়ে বোৰার চেষ্টা করল কোথায় রয়েছে। রাস্তার আলোর নিচে চলে এল এ সময় গাড়ি। কনুই দিয়ে মুসার গায়ে ওঁতো মারল কিশোর।

‘দেখো দেখো!’ কিসিফিস করে বলল সে। ‘চিনতে পারছ লোকটাকে? কোট পরা লোকটা, যার কোটের সঙ্গে ক্যাপটা মেলে। সিংহের খাচায় রঙ করছিল যে।’

‘হ্যা,’ মাথা বৌকাল মুসা। ‘একই ক্যারাভানে থাকত তো, আমার মনে হয়, ওর ক্যাপটা ধার নিয়েছিল চোর। গুৰু সহা করতে না পেরে ছাঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে গাছের ডালে। যাক, আরেকটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল।’

জানালার শার্সি খোলার চেষ্টা চালাল কিশোর। খুলতে গিয়ে শব্দ করে ফেলল। বাট করে পেছনে ফিরে তাকাল লোকটা। রাস্তার আলোয় নিচয় চোখে পড়ে গেল ওদেরকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া খানিয়ে লাফিয়ে নেমে এল সীট থেকে। দোড়ে এল সিঁড়ির দিকে।

‘সেবেছে!’ বলে উঠল কিশোর। ‘দেখে ফেলেছে বোধহয় আমাদের। জলদি, আবার বাকের নিচে চোকো।’

## সতেরো

তালা খেলার শব্দ হলো। ঘটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। শক্তিশালী টর্চ হাতে ভেতরে ঢুকল লোকটা। চারপাশে আলো ফেলে দেখতে শুরু করল।

আবার বাক্সের নিচে ঢুকে পড়ায় দুই গোয়েন্দাকে দেখতে পেল না। কিন্তু এবার সে জানে, ভেতরে কেউ আছে। কাজেই সবথামে না দেখে থামবে না। বিছানার চাদরের ঝুল সরাল সে। দেখে ফেলল কিশোরকে।

হাত ধরে টেনে-চিঢ়ে বের করে নিয়ে এল ওকে। প্রচণ্ড রাগে কাঁধ ধরে এত জোরে ঘোকাতে শুরু করল, চিন্কার করে উঠল কিশোর। মুসা বুঝল, লুকিয়ে থেকে আর লাভ নেই। সে-ও বেরিয়ে এল। যদি কোন সাহায্য করা যাব কিশোরকে।

‘অ, তাহলে দু’জন!’ চিংকার করে উঠল লোকটা। ‘এখানে কি করছিলে? কতক্ষণ ধরে আছ?’

‘বেশিক্ষণ না,’ জবাব দিল কিশোর। ‘ভুল করে ঢুকে পড়েছি। আরেকটা ক্যারাভানে ঢুকতে চেয়েছিলাম, ঢুকে পড়েছি এটাতে।’

‘এ গল্প আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?’ আরও রেগে গেল লোকটা। ‘চাবকে পিঠের ছাল তুলে ফেলব! জন্মের শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব! অন্যের ক্যারাভানে ভুল করেও আর ঢুকতে সাহস পাবে না কোনদিন।’

একটা তাকের ওপর ঢট্টা শুইয়ে রাখল সে। সেই আলোয় ক্যারাভানের ভেতরটা প্রায় পুরোটাই ঢেখে পড়ছে। কোটের হাতা দুটো যতটা পারল ঠেলে তুলে দিল কনুইয়ের কাছে। বিপদের আশঙ্কার শক্তি।

হঠাৎ পা তুলে ঢট্টায় এক লাখি মারল মুসা। ঘটকা দিয়ে শূন্যে উঠে শব্দ করে মেঝেতে পরদ ওটা। কাঁচ ভাঙল, বাল ভাঙল। নিতে গেল আলো। আবার অঙ্ককারে নিমজ্জিত হলো ক্যারাভান।

লোকটার পেটে ওটো মারার জন্যে মাথা নিচু করে ছুটে গেল সে। অঙ্ককারে লক্ষ্য হয়ে চলে গেল দরজার দিকে। তীর গতিতে বেরিয়ে গ্রেল দরজা দিয়ে। সিঁড়িতে পড়ল প্রথমে। সেখান থেকে যয়দার বস্তাৰ মত ধপাস করে গিয়ে পড়ল নিচের রাস্তায়।

ঠাস করে এক ঢুক এসে লাগল কিশোরের গালে। রেগে পেল সে। লোকটাকে লক্ষ্য করে ঘোপ দিল। মাথা নিচু করে পড়ল লোকটার পায়ের কাছে। তার মারল পা ধরে টালে উঠল লোকটা। সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে গেল। শরীর মুচড়ে মুচড়ে সিঁড়ির দিকে সরে গেল কিশোর। গড়িয়ে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। তবে মুসার মত ব্যথা পেল না। সেখান থেকে উঠে ঢুকে পড়ল বোপের মধ্যে।

এ সব উল্টোপাল্টা কাও দেখে ভড়কে গিয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। ছোটার সময় একবার এপাশে একবার ওপাশে সরে গিয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দোল থেকে লাগল ক্যারাভানের পেছনটা। প্রচণ্ড ঘোক থাচ্ছে। ভেতর থেকে শোনা গেল লোকটার ভয়াত চিংকার।

‘মুসা! এই মুসার!’ ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। ‘জলদি বেরিয়ে এসো। ঘোড়া সামলে নিয়ে লোকটা ফিরে আসার আগেই পালাই।’

আরেকটা ঘোপ থেকে বেরিয়ে এল মুসা। বাস্তা ধরে উল্টো দিকে ছুটল দু’জনে পড়িয়ারি করে।

‘এবারকর কেসের প্রতিটি ব্যাপারই খালি বায়েলা পাকাচ্ছে,’ কিছুদূর এগিয়ে গতি কমানোর পর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। ‘করতে যাই একটা, হয়ে যায় আরেকটা। সঠিক ক্যারাভানটাতে পর্যন্ত ঢুকতে পারলাম না। ঢুকলাম গিয়ে অন্টায়।’

‘তাতে লোকসান অবশ্য হয়নি,’ জবাব দিল কিশোর। ‘নিশ্চিত হলাম, নীল মোজাঙ্গলো চোরটারই। চেহারা দেখতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি আর করা। গলাটা চেনা চেনা লেগেছে। মনে করতে পারছি না কার।’

‘কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা?’ জিজ্ঞেস করল মুসা। ‘সার্কাসে? না বাড়িতে? এদিকের এই রাস্তাটা শুনেছি ভাল না। ভূত আছে। শেষে রাত দুপুরে গথ ভুলিয়ে না আবার অন্য কোনদিকে নিয়ে চলে যাব।’

ভূতের কথা কানেই তুলল না কিশোর। বলল, ‘সার্কাসের মাঠেই ফিরে যাব। মোজাঙ্গলো কার পায়ে দেখতে হবে।’

কিন্তু সার্কাসে ঢুকতে আর ভাল লাগছে না মুসার। বলল, সে গেটের কাছে অপেক্ষা করবে।

বেড়া টপকে আবার মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ল কিশোর। শো শেষ। বাড়ি চলে গেছে দর্শকরা।

এক জারপায় অনেকগুলো আলো দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে চলল সেদিকে। রাতের ঘাবার থেকে বসেছে সার্কাসের লোকেরা। উজ্জ্বল হাসিমুশি আলো ছড়াচ্ছে।

চোরের আস্তানা

যেন অগ্রিকুণ আর লঞ্চনগুলো।

আলোর কাছাকাছি কতগুলো ছেলেমেয়েকে খেলতে দেখল কিশোর। একজন অস্বাভাবিক লম্বা। কাছে যেতে দেখা গেল সেই মেয়েটা, যাকে চকলেট দিয়েছিল। বন-পায় তর করে হাঁচছে। এগিয়ে আসতে লাগল। ক্যারাভানের ছায়ায় গা ঢেকে রয়েছে কিশোর। তারপরেও হয়তো তাকে দেখে ফেলত মেয়েটা, কিন্তু তার মনোযোগ নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে, অন্য কোন দিকে নজর দিতে পারছে না তাই।

কিশোরের সামনে দিয়ে চলে গেল মেয়েটা। মাটির দিকে চোখ পড়তে দৃষ্টি ছির হয়ে গেল কিশোরে। গোল গোল দাগ পড়েছে বন-পা'র চাপে। ওরিয়ন ফোটের দেয়ালের কাছে যেমন দেখেছিল। কাছের একটা লঞ্চন থেকে এসে পড়া আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দাগগুলো।

'আমি একটা গাধা!' আনন্দে বিড়বিড় করল কিশোর। 'নইলে অনেক আগেই বুঝে যাওয়া উচিত ছিল এত সহজ ব্যাপারটা!'

## আঠারো

মুখ তুলে আবার মেয়েটার দিকে তাকাল সে। যেদিকেই যাচ্ছে, মাটিতে গোল দাগ রেখে যাচ্ছে। মাটের মধ্যে দাগের কারণ বোৰা গেল। সমাধান হলো আরেকটা রহস্যের।

'চোরটা বন-পা'র খেলা দেখায়,' নিজেকে বলল সে। 'ওগুলো নিয়ে চলে গিয়েছিল ওরিয়ন ফোটে। মুসাকে বলা দরকার।'

গেটের দিকে দৌড় দিল সে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মুসা।

'মুসা, সাংঘাতিক এক আবিক্ষার করে এলায়!' বলল কিশোর। 'গোল গোল দাগগুলো কিসের, দেখে এসেছি। যৌড়া মানুষের পায়ের দাগ নয়।'

'খাইছে! তাহলে কিসের?'

'বন-পা। মাথাটা গোল, লোহার আংটা পরানো থাকে। ওগুলো পরে খুব সহজেই দেয়ালের মাথার নাগাল পাওয়া সম্ভব। চালাকিটা ভালই করেছিল।'

'কিন্তু কি ভাবে দেয়াল উপকাল?' মাথায় তুকচ্ছে না মুসার। 'কিশোর, বাড়ি চলো। বছত আমেলা গেছে। আমার আর কিছু ভাল লাগছে না এখন। খুব ক্লান্ত

লাগছে।'

'আমারও,' কিশোর বলল। 'ঠিক আছে, চলো। আজ আর কিছু ভাবব না। কাল সকাল বেলা মীটিঙে আলোচনা করব। ফারিহাকে পাঠিয়ে সবাইকে আসতে খবর দিয়ে দিও।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'বন-পা লাগিয়ে কি ভাবে তেতরে চুকল, সেটা এখনও বুঝতে পারছি না আমি।'

বোবার অবস্থা মুসারও নেই। বড় করে হাই তুলল। ক্যারাভান থেকে পড়ে গিয়ে কপালে বাড়ি দেয়েছে। বাথা করছে। ঘোলাটে লাগছে মাথার ভেতরটা। বাড়ি গিয়ে সোজা বিছানায় গড়িয়ে পড়ার জন্যে অস্থির।

বাড়ি ফিরল যখন সে, ফারিহা তখন গভীর ঘুমে অচেতন। ওকে জাগাল না। সোজা চলে এল নিজের ঘরে।

ওদিকে বিছানায় শুয়ে ধানিক ভাবার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু সে-ও ক্লান্ত। সারাটা দিন অনেক পরিশৃঙ্খল করেছে। ধক্কল গেছে শরীরের ওপর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে রাতের অভিযানের কথা ফারিহার কাছে চেপে গেল মুসা। মীটিঙে সবার সামনে ফাঁস করা হবে। বলল, জরুরী আলোচনা আছে। সবাইকে খবর দিতে। কিশোরদের বাড়িতে যেতে হবে।

ছাউনিতে চুকেই কিশোরকে দেখে প্রশ্নের তুবড়ি ছেটাল অনিতা, 'কি হয়েছিল কাল রাতে? হারটা পেয়েছ? সেরটা কে, জানতে পেরেছ?'

'হারটা কোথায় জানি না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে বাকি সমস্ত রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি।'

'তাই নাকি?' শুনে মুসা ও অবাক। 'কই, আমি তো জানি না! কখন করলে? আমার মাথার মধ্যেটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। বিষয়বিম করছে।'

'বলে ফেলো, কিশোর,' বল বলল। 'জলন্দি! সহ্য করতে পারছি না আর।' 'এখানে কিছু না বলে চলো হেয়ার ফরেস্টে চলে যাই,' কিশোর বলল। 'চোরটা কি করে চুকেছিল দেখাৰ তোমাদের।'

'এখানেই বলে ফেলো না!' অন্যদের মতই অস্থির হয়ে গেছে ফারিহা। তব সইছে না।

'না। ওখানে গিয়েই দেখাৰ,' মাটকীয়তা খুব পছন্দ কিশোরের। সুতরাং কি আর করা। দল বেঁধে আবার হেয়ার ফরেস্টে রওনা হলো ওরা। ওরিয়ন ফোটের গেটের কাছে এসে দেখল, ফুলের বেঁড়ে কাজ করছে মালী।

'বিটেল? গেটটা খুলে দেবেন?' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'তেতরে চুকল

আমরা। কাজ আছে।'

হাসিমুখে গেট খুলে দিল বিটেল। 'কিছু পেয়েছ নাকি?'

হড়োছড়ি করে ভেতরে চুকে পড়ল ছেলেমেয়েরা।

'হ্যা, অনেক কিছু,' জবাব দিল কিশোর। 'আসুন আমার সঙ্গে। দেখাইছি।' মেখান দিয়ে দেয়াল উপকেছে চোরটা, সেখানে নিয়ে চলল সবাইকে।

গেটের কাছে গাড়ির হর্ষ শোনা গেল। বিটেল বলল, 'তোমরা এগোও। আমি গেট খুলে দিয়ে আসি।'

দলবল নিয়ে দাগগুলোর কাছে এসে দাঢ়াল কিশোর।

'ভালম্বিত দেখো সব, তাহলেই বুঝতে পারবে,' বলল সে। 'রন-পা পরে ছাটতে পারে লোকটা। রন-পা নিয়ে দেয়ালের বাইরে এসে দাঢ়িয়েছিল। ওগুলোতে চড়ে দেয়ালের মাথার নাগাল পেয়েছে। উচ্চে বসেছিল ওপরে। পা থেকে আবার রন-পা খুলে নিয়ে এ পাশে নামিয়ে দেয়। দেয়াল থেকে নামতেও ওগুলো ব্যবহার করে। রন-পা'র চড়েই হেঁটে যায় বাড়ির দিকে, তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় বলে। দেয়ালের কাছের নরম মাটিতে দাগ বসে যায় তাতে। কিন্তু বাগানের শক্ত মাটিতে বসতে পারেনি। পাতাবাহারের বাড়ের মধ্যে ওগুলো লুকিয়ে রেখে বাড়িতে চুকে পড়ে।'

থামল কিশোর।

'থামলে কেন? বলো না!' কিশোরকে দম নিতে দিতেও রাজি নয় ফারিহা।

'বাড়িতে চুকে, হারটা চুরি করে, রন-পা নিয়ে চলে যায় আবার দেয়ালের কাছে। মাটিতে রেখে যায় আরও কিছু গোল দাগ।'

'ঠিক বলেছে!' দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল অনিতা।

'আবার দেয়ালে চড়ে,' কিশোর বলল। 'মাথার টুপিটা ভালে আটকে যায়। ওটা খুলে নেয়ার বামেলাটুকু ও করতে চায়নি। কারণ জিনিসটা বাতিল। তা ছাড়া দুর্গম। সহ্য করতে পারছিল না বোধহয় সে। তাড়াহড়োও ছিল। খুলতে গেলে সময় নষ্ট হবে। তাড়াহড়ার কারণেই মোজাও লেগে যায় ধারাল ইটের কোনায়। সুতো ছিড়ে রয়ে যায়। ওসবের পরোয়া না করে দেয়ালের মাথা থেকে লাক দিয়ে নেমে যায় অন্য পাশে।'

'নিশ্চয় ওই সময়ই আমার চোখে পড়ে সে।' মুসা বলল। 'কিন্তু কিশোর, ওর পায়ে তো তখন রন-পা ছিল না। ওগুলো কি করেছে?'

## উনিশ

'কি করেছে, খনবে?' নিচের ঠোটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'অনুমান করতে পারি। দেয়ালের মাথায় চড়ে প্রথমে ঘন বোপে ছুঁড়ে ফেলেছিল ওগুলো। তারপর লাক দিয়ে মাটিতে নেমেছে। নামার সময়ই কেবল ওকে চোখে পড়েছে তোমার, তার আগে নয়।'

'ঠিক! ঠিক। তা-ই হবে,' অনিতা বলল। 'কিন্তু কোন বোপটাতে ফেলল?'

দেয়ালের ওপর দিয়ে যে সব গাছপালা আর উচু বোপ দেখা যাচ্ছে, পিছিয়ে এসে সেগুলোর দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

'হলি গাছের বাড়ি!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'যেমন ঘন, তেমনি কাটা। পারতপক্ষে কেউ যেতে চায় না হলি বাড়ির দিকে। রন-পাগুলো ফেলে কাটার ভয়ে চোরটা নিজেও সেগুলো বের করে আনতে যাইনি। পরে এসে যদি নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আলাদা কথা। মুসা যতক্ষণ গাছের ওপর ছিল ততক্ষণ অস্তিত্ব নেয়নি।'

'ঠিক,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এটাই জবাব। চলো, খুঁজে বের করি।'

দল বেঁধে আবার গেটের দিকে ছুটল ওরা। বাইরে বেরিয়ে দেয়াল ঘূরে দৌড়ে এল সেই জায়গাটাতে, যেখান দিয়ে চুকেছিল চোরটা।

কাছাকাছি যে হলি বাড়টা রয়েছে, সেটার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, ছেঁটাট দুয়েকটা ভাঙ্গা ভাল। পাতা মরে শুকিয়ে এসেছে। ভারী কিছুর আঘাতেই তেজেছে বোবা যায়। বেশি খোজাখুজি করতে হলো না। নিচু হয়ে তাকাতেই ভেতরে দেখতে পেল দুটো রন-পা পড়ে আছে। কাটার ভয় না করে হাত চুকিয়ে দিল কিশোর। তেমে বের করে আনল রন-পা দুটো।

'দারণ! দারণ!' হাততালি দিয়ে চেচাতে শুরু করল ফারিহা। 'সমাধানটা তাহলে করেই ছাড়লে!'

'হার চুরির সমাধান, তাই না?' বলে উঠল আরেকটা কষ্ট। ফিরে তাকিয়ে দেখে ওরা, মাত্র দশ গজ দূরে বিটেলের সঙ্গে দাঢ়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন।

'ক্যাপ্টেন!' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘হ্যাঁ, এসেছিলাম মিসেস ওরিয়নের সঙ্গে কথা বলতে,’ কাছে এসে বললেন ক্যাপ্টেন। ‘বিটেল আমাকে বলল, কেসটাৰ সমাধান নাকি করে ফেলেছ তোমোৱা। একটা পৰ তোমাদেৱকে গেট দিয়ে ছুটে বেৰিয়ে যেতে দেখলাম। বুৰালাম, কিছু একটা হয়েছে। ঘটনটা কি? পুলিশকে টেক্কা দিলে নাকি আবারও?’

হেসে উঠল কিশোৱ। ‘তা বলতে পাৱেন। তবে আমোৱা ছোট বলেই পাৰলাম। ছেলেমানুষ ভেবে কেউ পাতা দেয়নি। সাত সাতজন পুলিশৰ লোক যদি আমাদেৱ মত গিয়ে সাৰ্কাসে ঘূৰাবুৰ কৰতে থাকত, চোৱটাকে খুঁজে বেৱ কৰা সহজ হত না। সতৰ্ক হয়ে যেত সে।

‘তা ঠিক,’ নিচু হয়ে একটা রন-পা তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন। ‘উচু দেয়াল টপকানোৰ চমৎকাৰ বুদ্ধি কৰেছিল। চোৱটা কে, তা-ও নিষ্ঠা বলতে পাৱে, তাই না?’

‘পাৱেব। সাৰ্কাসে রন-পা পৱে খেলা দেখায়,’ জবাৰ দিল কিশোৱ, ‘সন্তৰত, ডুৰেক। নীল রঙেৰ মোজা পৱে সে। মোজাৰ নীল উলেৱ সঙ্গে লাল সুতোৰ মিশ্ৰণ রয়েছে।’

‘তাৰ মাথায় কালো চুল,’ মুসা বলল, ‘চান্দিতে গোল একটা বশী টাক।’

‘বাপৱে! এত কিছু জানো! অবাক না হয়ে পাৱলেন না ক্যাপ্টেন। ‘কোন রঙেৰ পাজামা পৱে ঘূৰায়, কি খায়, তা-ও নিষ্ঠা বলে দিতে পাৱে। তা যাবে নাকি একবাৰ সাৰ্কাসে? আমিও যেতাম তাহলে। গাড়িতে দু'জন লোক বসে আছে আমোৱ। ওৱাৰও যাবে।’

তিন-তিনজন পুলিশ অফিসারেৰ সঙ্গে সাৰ্কাসেৰ মাঠে ঘূৰে বেড়ানোৰ দৃশ্যটা কল্পনা কৰে রোমাঞ্চিত হলো ডলি। ‘আমাদেৱ দেখে ভয় পেয়ে যাবে সাৰ্কাসেৰ লোকেৱো, তাই না?’

‘তা পাৰে কেন? সবাই তো আৱ চোৱ নয়া।’ মুসাৰ দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, চলো গিয়ে দেখে আসি লোকটাৰ চাঁদিৰ টাকটা।’

আৱেকবাৰ সাৰ্কাসেৰ মাঠে এসে ঢুকল ওৱা। গাড়িতে কৰে আগেই গেটেৰ কাছে এসে বসে ছিল পুলিশ। এক গাড়িতে এতজনেৰ জায়গা হয় না, তাই গোয়েন্দৰা হেঠে এসেছে। ওদেৱকে নিয়ে ভেতৱে ঢুকল তিনজন পুলিশ অফিসার।

‘ওই যে, ডুৰেক,’ একটা কাৰাভানেৰ কাছে খুকে থাকা গোমড়ামুখো লোকটাকে দেখাল কিশোৱ। ‘কিন্তু পাৱে তো মোজা নেই।’

‘তাতে কি?’ মুসা বলল। ‘ওৱ টাক আছে কিমা দেখব। পুলিশ বললে ক্যাপ

ঢুলতে আৱ মানা কৰতে পাৱে না।’

কাজ কৰহে ঢুৰেক। ওৱা কাছে আসতে মুখ তুলে তাকাল। পুলিশ দেখে অৱস্থি ফুটল চোখে।

‘কি মিয়া, তোমাৰ মোজাগুলো কোথায়?’ জিজেস কৱলেন ক্যাপ্টেন।

‘কই, মোজা নেই।’ বিমুচ্চেৱ মত ট্ৰাইউজারেৰ নিচেৰ দিক উঠু কৰে দেখাল ডুৰেক। খালি পা।

‘আমি জানতে চাইছি, কোথায় রেখে এসেছ?’

ডুৰেক জবাৰ দেয়াৰ আগেই মুসা বলে উঠল, ‘আগে ওকে চান্দিটা দেখাতে বলুন, ক্যাপ্টেন।’

‘ক্যাপ খোলো,’ আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। ‘মাথাটা নোয়াও। ওৱা দেখুক।’

আৱও বোকা হয়ে গেল ডুৰেক। কি সব কৰতে বলা হচ্ছে তাকে। তবে যা বলা হলো, কৰল।

এক পলক দেখেই চিংকাৰ কৰে উঠল মুসা, ‘এই তো! সেই চান্দি! সেই টাক! কি বিছিৰি দেখতে! এ জন্মেই সারাক্ষণ ক্যাপ পৱে থাকে।’

বিড়বিড় কৰে কি বলল ডুৰেক, বোৰা গেল না।

‘ক্যাপ্টেন,’ আৱাৰ বলল মুসা, ‘এ লোকটাকেই সেদিন গাছে চড়তে দেখেছিলাম। আমি শিখো।’

‘ওড়! মাথা দুলিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন। ডুৰেকেৰ দিকে ফিরলেন। ‘অ্যাই মিয়া, আৱেকটা প্ৰশ্নেৰ জবাৰ দাও দেখি। হারটা কোথায় লুকিয়েছে?’

## বিশ

গোমড়া মুখটা আৱও গোমড়া হয়ে গেল ডুৰেকেৰ। ‘পাগল নাকি! কি সব বলে? একবাৰ জিজেস কৰে মোজাৰ কথা, একবাৰ চান্দি দেখে, এখন বল হার। কিসেৰ হার? কোনও হারেৰ কথা আমি জানি না।’

‘তাই নাকি?’ কঠোৱ হয়ে গেল ক্যাপ্টেনেৰ চোয়াল। ‘না জানাৰ ভাব কৰে আৱ কোন লাভ নেই, ডুৰেক। সব কথা জেনে গৈছি আমোৱা। কি কৰে রন-পা’ৰ সাহায্যে দেয়াল টপকেছ, ওৱিয়ন ফোটে ঢুকে হার চুৱি কৰেছ, রন-পাণ্ডুলো তাৱপৰ কোনখানে ছুঁড়ে ফেলেছ। সব।’

চোৱেৱ আস্থান

‘আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না,’ বলল ভূরেক। তবে গলায় জোর নেই আগের মত। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

‘ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি,’ ক্যাটেন বললেন। ‘দেয়ালের কাছে রন-পা’র দাগ রেখে এসেছে তুমি।’ পকেট থেকে কিশোরের দেয়া সূত্রগুলো বের করলেন। ‘এই টুপিটা ফেলে এসেছে গাছের ডালে, এই ডালের সুত্রগুটা ছিঁড়ে রেখে এসেছে তোমার মোজা থেকে। তোমার রন-পাগুলো পাওয়া গেছে হলি বাড়ের মধ্যে। এত কাও শুধু শুধু করোনি! এখন বলে ফেলো, হারটা কোথায়?’

ভূরেককে চুপ করে থাকতে দেখে কঠোর পুলিশী কঠে ধমকে উঠলেন ক্যাটেন, ‘কি হলো? জবাব দিচ্ছ না কেন?’

‘আ-আমি তো কিছু জানি না,’ আমতা আমতা করে বলল ভূরেক। ‘তবে এখন মনে হচ্ছে, শেফার্ড ওটা নিয়ে পালিয়েছে। আমাকে ফাঁসানোর জন্যে চালাকি করে আমার জিনিসপত্র পরে চুরি করতে গিয়েছিল।’

‘শেফার্ডটা কে? কাল রাতে যে লোকটা ক্যারাভানে করে চলে গেছে সে তো? না, হার সে নেয়নি,’ কিশোর বলল। ‘হারটা আশেপাশেই কোথাও আছে। কাল রাতে আপনারা যখন কথা বলছিলেন বাকের নিচে দুকিয়ে থেকে সব শুনেছি আমি আর মুসা।’

চমকে গেল ভূরেক। জুলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। কিছু বলল না।

‘আপনি যে বলেছেন, সিংহের পাহাড়া দেবে, সেটাও শুনেছি,’ কিশোর বলল। ‘বলেননি?’

এবাবও ভূরেক নির্বাক।

‘বেশ,’ ক্যাটেন বললেন। ‘যৌজায়ুজিটা তাহলে আমাদেরই করতে হচ্ছে। সিংহের খাচাটা থেকেই শুরু করি।’

দুজন পুলিশ আর সাতজন গোয়েন্দার বিশাল বহর নিয়ে সিংহের খাচার দিকে রওনা হলেন ক্যাটেন। সঙ্গে মিছিল করে চলল জন তিরিশেক সার্কাসের লোক। শুধু ভালুকছানাটাও কি করে যেন ছাড়া পেয়ে গেছে। যেহা আনন্দে লাফাতে লাফাতে শুটা ও চলল জনতার সঙ্গে।

খাচার কাছে এসে সিংহের ট্রেনার কোথায় জিজ্ঞেস করলেন ক্যাটেন।

ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লম্বা একজন লোক। অবাক হয়েছে। শক্তিশালী।

‘নাম কি আপনার?’ জানতে চাইলেন ক্যাটেন।

‘আলবার্টো,’ জবাব দিল লোকটা।

‘মিস্টার আলবার্টো, আমাদের ধারণা, আপনার সিংহের খাচায় একটা মূল্যবান মুকোর হার লুকানো আছে। আপনি কিছু জানেন?’

আলবার্টোর চোখ দেখে মনে হলো কোটির থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। এমন করে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেনের দিকে, যেন ভুল শুনছে।

‘যান, খাচায় ঢুকে খুঁজে বের করুন ওটা,’ নির্দেশ দিলেন ক্যাটেন।

খাচার দরবাজার তালা খুলল আলবার্টো। ভঙ্গিতে অবিশ্বাস। সিংহগুলো তাকিয়ে আছে তার দিকে। মৃদু গরগর করল একটা সিংহ।

খাচার মেঝের তক্তাগুলো জুতোর ডগা দিয়ে ঢুকে ঢুকে দেখল আলবার্টো। কোনটা থেকেই ফাঁপা শব্দ বেরোল না। আলগা হয়েও নেই কোনটা। ফিরে তাকাল। খাচার বাইরের সবগুলো চোখ এখন তার দিকে। ক্যাটেনকে বলল, ‘না, স্যার, নেই এখানে।’ সিংহের কেশরেও লুকিয়ে রাখ সম্ভব না। চুলকাতে গিয়ে ফেলে দেবে।’

ভূরেকের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে ঘন ঘন। হঠাতে চিৎকার করে উঠল, ‘ক্যাটেন, পানির পাত্রটায় দেখতে বলুন।’

ক্যাটেন বলার আগেই ওটার দিকে এগিয়ে গেল আলবার্টো। ভুলে নিয়ে কাত করে ফেলে দিল সমস্ত পানি। ‘কই, নেই তো।’

‘উপুড় করুন।’ কিশোর বলল।

পাত্রটা উপুড় করল আলবার্টো। অস্কুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। ‘একি!’ দেখা গেল, খালাই করে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে একটা পাত। ‘এটা তো আগে ছিল না।’

পাত্রটা বের করে আনা হলো। সার্কাসের লোকের কাছ থেকে একটা ক্ষুদ্রভাবে চেয়ে নিল কিশোর। সেটার মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে নহজেই খুলে ফেলল পাতলা তিনের পাত্রটা। ভেতর থেকে বের করে আনল একটা মুকোর হার। পানির পাত্রের নিচে বেশ কায়দা করে ছোট একটা কুঠির বানিয়ে, তার ভেতরে হারটা রেখে, পাত লাগিয়ে বঞ্চ করে দেয়া হয়েছিল।

হারটা পাওয়ার পর এমন হঠগোল শুরু হলো, ঘাবড়ে গিয়ে গর্জন করে উঠল একটা সিংহ। ওটার দেবাদেৰি বাকিগুলোও অস্থির হয়ে ভাকতে শুরু করল। শান্ত করতে গেল আলবার্টো।

সিংহের গর্জনে ভয় পেয়ে ফারিহার পা ধেঁষে গিয়ে দাঢ়াল ভালুকছানাটা। আশ্রয় খুঁজল তার কাছে। নিচ হয়ে ভুলতে গেল ফারিহার। পারল না।

হারটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে পকেটে রেখে দিলেন চোরের আস্তানা।

ক্যাপ্টেন। হেসে বললেন গোয়েন্দাদের, ‘পুলিশের তরফ থেকে তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

ভুরেকের চেঁচামেচি শব্দে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, হাতকড়া লাগিয়ে দিচ্ছে দু'জন অফিসার। তাকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগোল। সামনে একটা কাপড় খোলানোর দড়ি পড়ল। তাতে রয়েছে সেই মোজা জোড়া। বাতাসে দুলে দুলে যেন জানিয়ে দিতে লাগল ভুরেকের শয়তানির কথা।

‘চলো,’ গোয়েন্দাদের বললেন ক্যাপ্টেন, ‘মিসেস ওরিয়নের সঙ্গে দেখা করে আসি। কি করে হারটা উদ্ধার করলে, তোমাই তাঁকে বোলো। বলা যায় না, বড় কোন পুরস্কারও তোমাদের দিয়ে ফেলতে পারেন তিনি। ফারিহা, কি পুরস্কার চাও?’

ভালুকছানাটার দিকে তাকাল ফারিহা। এখনও ওটা তার পা ঘেঁষে রয়েছে। ‘উনি কি আমাকে একটা ভালুকের বাচ্চা দিতে পারবেন? এটার মত? তবে আরও ছোট, ওজন কম, যাতে কোলে নিতে পারি। অনিতাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সে-ও ভালুকের বাচ্চাই চাইবে।’

জোরে হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন। ‘দারুণ উপহার চাইলে তো।’ কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। ‘কি, কিশোর? তুমি কি চাও?’

‘আপনাদের খাতায় তো অনেক অসমাঞ্ছ রহস্যের কথা দেখা থাকে, স্যার,’ জবাব দিল কিশোর। ‘ওগুলোর কোন একটা কেন যদি দেন।’

‘সমাধান করার জন্যে?’

মাথা বাঁকাল কিশোর। ‘নিশ্চয়! জবাব দিতে একটুও দেরি হলো না তার।

\*\*\*

## মেডেল রহস্য

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১

### এক

লম্বা ছুটি। রাকি বীচ থেকে গ্রীনহিলসে চলে এসেছে আবার কিশোররা। প্রতি বছরই দীর্ঘ দিনের জন্যে আসে এ-রকম। ছুটি শেষ হলে ফিরে যায়।

সেদিন বিকেল বেলা লধশের অন্যান্য সদস্যদের ফোন করল কিশোর ও মিশা। বলল মীটিং বসছে ছাউনিতে। বেশ বড় একটিন চকলেট বিস্কুট পাওয়া গেছে, সেকথাও জানাল। কারও কাছে ড্রিংক-ট্রিংক কিছু থাকলে নিয়ে আসার অনুরোধ জানাল কিশোর। বলল, যগ সরবরাহ করা যাবে।

শেষ ফোনটা করে রিসিভার রাখতে রাখতে বিরক্ত কষ্টে বলল সে, 'দূর, টেলিফোনে কথা বলতে ভাল্লাগে না! এত বেশি বকবক করে সবাই, মাথা ধরে যায়।'

'মুসা আর ববের সঙ্গে কথা বলার সময় তুমই কি কম বকবক করো?' মুখের ওপর বলে দিল মিশা। 'যাকগে ওসব কথা। মুসার সাথে কথা বলার সময় বাবলি শুনে ফেলেছে বললে, গোলমাল করবে না তো? মীটিংগে বসছি যে সেকথা নিশ্চয় বুঝে ফেলেছে।'

মেরিচাটীর বোনের মেয়ে সে। বোন মারা গেলে মিশাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন তিনি।

'সুযোগ পাবে না। মুসা বলল, কাল নাকি যেমন-খুশি-সাজো খেলায় যোগ দিতে যাচ্ছে বাবলি। পার্টি দিচ্ছে ওর এক বক্সু।'

'নিনা নিশ্চয়?'

'মনে হয়। জিজ্ঞেস করিনি।'

অনেক দিন মীটিং বসে না, আগোছাল আর নোংরা হয়ে আছে ঘরটা। পরদিন মীটিংগের আগেই ঢুকে সেসব পরিষ্কার করে ফেলতে লাগল কিশোর ও মিশা মিলে।

মীটিং শুরু হবে পাঁচটায়। অপেক্ষা করছে কিশোর, মিশা আর টিটু। পাঁচটা পাঁচ বেজে গেল। কেউ এল না। জুলজুল করে বিস্কুটের টিনটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে টিটু আর জিংব চাটছে। তারপর হঠাতে করেই গুঙ্গিয়ে উঠল। পায়ের শব্দ

ওনতে পেয়েছে।

'আসছে,' কিশোর বলল।

দরজায় টোকা পড়ল।

'সঙ্গেত বলে,' ভিতর থেকে বলল কিশোর।

একসাথে জবাব দিল অনিতা আর ডলি, 'ছুটি।'

দরজা খুলে দিয়ে হেসে ডাকল কিশোর, 'এসো।'

আবার কেউ এল।

সঙ্গেত জিজেস করল কিশোর।

বিন জবাব দিল, 'ছুটি।'

তার পর পরই এল বব। ভিতরে ঢুকে বলল, 'যাক, আবার তাহলে একসাথ হওয়া গেল। ঘরটা বাকি, আজ বিকেলটাই কেমন অক্কার।'

'গুশু মুসা বাকি,' কিশোর বলল। নিচের টোট কামড়ে ধরল সে। 'ও এখনও আসছে না কেন?'

এল মুসা। মীটিং শুরু হতে যাবে এই সময় আচমকা গরগর শুরু করল টিটু। পাহারার দরকার মনে করেনি কিশোর, তাই টিটুকে বাইরে বসায়নি। ও বসে আছে ঘরের কোণে। গরগর করেই চলল সে। অবাক হয়ে সবাই তাকাল তার দিকে।

'কি রে টিটু, কী হয়েছে?' কিশোর জিজেস করল। জবাবে আরও জোরে গরগর করে উঠল কুকুরটা।

'এই, কী হয়েছে? আরে, মুসার দিকে চেয়ে ওরকম করছে কেন?' ডলি বলল। 'ওরকম করছিস কেনরে? আবার দাঁতও পিচাচ্ছে। মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি...।'

'আমাদের কাউকে দেখে আগে তো কখনও ওরকম করেনি!' মিশা বলল। 'এই টিটু, চুপ কর। মাথায় হ্যাট পরেছ কেন? খুলে ফেলো। বোধহয় যে-জন্মেই ও ওরকম করছে।'

কিন্তু হ্যাট খুলল না মুসা। মুখ চুরিয়ে রইল আরেক দিকে।

হ্যাঁ থাবা দিয়ে তার মাথা থেকে হ্যাটটা ফেলে দিল বব। অবাক হয়ে গেল সবাই। রেগেও গেল। হ্যাটের নিচ থেকে কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়ল লঘ চুল।

'বাবলি!' দাগে চিৎকাৰ করে উঠল কিশোর। 'এন্দৰ সাহস তোমার! ফাঁকি দিয়ে আমাদের হেভেনেয়ারে দেকো! মুসা জামা কাপড় পরেছ বলেই ভেবেছ টিটুর চোখকেও ফাঁকি দিতে পারবে...যাও, বেরোও!'

'যাচ্ছ, বাবা, যাচ্ছ,' ফিকফিক করে শয়তানী হাসি হাসল বাবলি। 'কি করে চুকলাম সেটা জিজেস করলে না? পাটিতে যাচ্ছলাম। আমাকে নিতে এসেছে নিনা। বাইরে লুকিয়ে আছে এখন ও। ছেলে সজাব জন্মে মুসার কাছ থেকে তার কাপড় ঢেয়ে নিয়েছি। আর জানেই তো, আমাৰ গলার বৰটাও অনেকটা ওৱাই মত। খোপের ভিতৰ লুকিয়ে থেকে ডলিকে সঙ্গেত বলতে তনেছি, চেঁচিয়ে কথা বলে তো। হি-হি। কেনন ফাঁকিটা দিলাম! নিজেদের বেশি চালাক তাৰো যে...'

'ফাঁকি সভাই দিয়েছ, শীকাৰ কৰছি,' বৰ বলল। টিটু না থাকলে...যাও, বেরোও এখন।'

'যাচ্ছ যাচ্ছ,' হাত তুলল বাবলি। 'যা কৰতে চেয়েছিলাম, কৰেছি, এখন আমি খুশি।' আবার শয়তানী হাসি ছড়াল মুখে। 'কাল হোনটা আমি ধৰেছিলাম। মুসার গলা নকল কৰে কথা বলেছি, ও তখন বাড়ি ছিল না। পৰে যখন এল, বললাম সাঙ্গে পাঁচটায় মীটিং, পাঁচটায় না। কাজেই ও মে দেৱি কৰে আসছে এটা ওৱাই মনে না। তা কিশোৰ মিয়া, কি মনে হয়, লধশ্ম চোকাৰ উপযুক্ত আমি?'

আবার সহ্য কৰতে পারল না বিশেৱ। বাবলিকে ধৰে হিড়হিড় কৰে টেনে নিয়ে এল দৰজার কাছে। একটানে দৰজা খুলে ধৰা দিয়ে বলল, 'বেশোও!'

বাবলি টেচিয়ে বলল, 'নিনা, এইবার।' ব্যাপাত কৰে একবালতি পানি এসে পড়ল ঘরের ভিতৰে। কিশোৰ তো বটেই, অনন্দেও গা ভিজে গেল। ততক্ষণে একলাকে বাইরে ঢেলে গেছে বাবলি।

খিলখিল কৰে হেসে উঠল সে আৰ নিনা। লধশ্মদেৱ পিণ্ডি জালিয়ে দিয়ে বাবলি বলল, 'গৰম একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলে তো, তাই ঠাঙ কৰে দিয়ে গেলাম। এসো নিনা, যাই।'

## দ্রুই

বাগে শুরু হয়ে গেল লধশ্ম। মুঠো তুলে টেচিয়ে উঠল কিশোৰ, 'বাবলি, মনে রেখো, এৰ শোধ আমি না নিয়েছি তো আমাৰ নাম কিশোৰ পাশা নয়।'

জবাবে আবার শোনা গেল গা ঝালানে খিলখিল হাসি।

ওদিকে মুসা জেনেছে সাঙ্গে পাঁচটায় মীটিং। সময়মত যাবার জন্মে রওনা হয়েছে, এই সময় হাসতে হাসতে এসে হাজিৰ হলো বাবলি আৰ নিনা। কী কৰে

এসেছে জানাল মুসাকে। শনে তো সিঁড়িতেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মুসা।  
তাকে আরও রাগানোর জনে বাবলি বলল, 'ইস, পানিটা যা সই করে  
হুঁচেছে না নিনা, যদি দেখতে! তোমাদের পিচ্ছি শার্ক হোমসটা দলবলসহ ভিজে  
একেবারে চপচপে।'

'তোমারে কেউ চিনল না?' বিখ্যাস করতে পারছে না মুসা।  
'গাধি তো, চিনবে কিভাবে। টিটুটা না থাকলে আজ মীটিংয়ের আলোচনাও  
শনে আসতাম। ওই কুন্তাটাই ধরিয়ে দিল।'

বিছুক্ষণ ওম হয়ে বসে রইল মুসা। অনেক দেরি করে ফেলেছে। মীটিংয়ে  
গিয়ে এখন আর লাভ নেই। বিশেষেরকে সোন করতে চলল।

ফোন ধরল মিশা। বলল, 'মুসা, সভায়ই তুমি তো? নাকি বাবলি, গলা নকল  
করে কথা বলছ?'

'না, না, আমি সভায়ই মুসা। ওই শয়াতানটার মাথা ভাঙব আজ্ঞ আমি। তা  
মীটিং তো নিশ্চয় আজ আসছে না?'

'নাহ। এ-রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে

'আবার করবে মীটিং?'

'বিশেষের বলল কাল রাতে সবাইকে আসতে।'

মুত্তোং, পরের সক্ষ্যায় আবার ছাউনিতে মিলিত হলো ওরা। এইবার আর  
মুসা ঢেকার পর তাকে দেখে রাগল না টিটু। তবু কিশোর তাকে ভালমত পরিক্ষা  
করার পর সবাই সন্তুষ্ট হলো, বাবলি নয়, মুসাই।

মুখ গোমড়া করে দেখেছে মুসা। তাকে খুশি করার জন্মে ডলি বলল, 'আকাজ  
করেছে তোমার বোন। তুমি মন খারাপ করে আছো কেন?'

'তাই তো,' কিশোর বলল, 'তুমি ওরকম করছো কেন? বাবলিটা তো  
চিরকালই শয়তান। তা ছাড়া দোষ তো আমাদেরও আছে। আমরা চিনলাম না  
কেন?...এই টিট, দরজা পাহারা দে গিয়ে।'

উঠে দরজার কাছে চলে গেল টিটু।

নিরাপদেই মীটি হলো সেদিন। চকলেট দেয়া বিস্কুটের টিনটা বেশ বড়।  
প্রত্যেকে ভাগে ছাটা করে বিস্কুট গেল। টিটুও বাদ পড়ল না। দরজার কাছে  
বসেই খেল সে। আর কান খাড়া রাখল সন্দেহজনক শব্দ শোনার আশায়।

'এখন আসল কথা শুন করা যাক,' বিস্কুট আর লেমোনেড শেষ করে  
নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আমাদের এই ঝাব টিকিয়ে রাখতে হলে কাজ

করা দরকার। অনেক দিন কিছু করতি না আমরা।'

'কি করব?' ডলির প্রশ্ন। 'রহস্য-রহস্য তো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। কাউকে  
সাহায্য করব? মীটিংয়ে নামে ছাউনিতে এসে অকারণে বসে থাকা আর খাওয়া  
আমারও ভাল লাগছে না।'

'আমারও না,' মিশা বলল। 'এ-ভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে কিছু  
একটা করা দরকার।'

'কিন্তু কী করব?' অনিতা বলল।

'আমারও সেটাই প্রশ্ন,' কিশোর বলল চিন্তিত ভঙ্গিতে, কি করব? একটা কিছু  
ভেবে বের করা দরকার। অনেকগুলো বেন আছে আমাদের। ভাবো, সবাই  
ভাবো।'

দীর্ঘ নীরবতা। সবাই ভাবছে। অবশ্যে মিশা বলল, 'এ-ভাবে বের করা  
যাবে না।'

'একটা কোন রহস্যের সমাধান তো করতে পারি আমরা?' বলল বৰ। 'কিংবা  
কাউকে সাহায্য, ওই মে ডলি-বলল তখন।'

'রহস্য একটাই মনে পড়ছে আমার,' হেসে বলল রবিন। 'আমাদের  
হেস্তস্যাদের চেয়ারটা দড়িতে বেধে বুলিয়ে রেখেছিল কে সেটা বের করার চেষ্টা  
করতে পারি। নেচুর সার। চেয়ারের ওই দস্তা দেখে তাঁর মুখের যা অবস্থা  
হয়েছিল না।'

'দূর, এটা কোন রহস্য হলো নাকি,' হাত নাড়ল ডলি। 'ভাল করেই জানি ও  
কাজ করা করেছে। বাবলি আর নিনা।'

অনিতা বলল, 'আমারও তাই মনে হয়।'  
আবাক কিন্তু চুপচাপ থাকার পর রবিনই বলল, 'আরেকটা রহস্যের কথা  
মনে পড়ছে। জ্বরারেল মরিসনের মেডেলগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করলে  
কেমন হয়? চুরি হয়ে গেছে ওগুলো, জানোই তো।'

অবাক হয়ে রবিনের দিকে তাকাল বৰ। 'কিভাবে চেষ্টা করব? পুলিশ তো  
কত চেষ্টা করল, মেডেলগুলোর কোন হনিসই করতে পারল না।'

'জানি। আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকেন তো,' রবিন বলল, 'তাঁর সব  
খবরাখবরই রাখি। কাল শিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। বাপানে ছিলেন তিনি তখন।  
মেডেলগুলোর কথা অনেকবার বললেন। খুব প্রিয় ছিল তাঁর ওগুলো। বলতে  
বলতে কেবলই ফেললেন।'

আবার চুপ হয়ে গেল সবাই। বয়করা সাধারণত কাদে না, আর সৈনিকরা  
মেডেল রহস্য

তো আরও কম কান্দে। কতখানি দুঃখ পেলে জেনারেলের মত একজন বৃক্ষ সৈনিক কান্দতে পারেন, আমরা করতে পারল ওরা।

কারণ খুব কথা নেই। এই নীরবতা টিটুর কাছে অস্থাভাবিক লাগল। মৃদু কুইকুই করে উঠল সে।

'আরে না না, টিটু, ভয়ের কিছুই নেই,' তাড়াতাড়ি বলল মিশা, 'আমরা ভাবছি। একজন মানুষের দুঃখের কথা ভাবছি। তোমা তো কঁদিস না, কাজেই ওসব বাপগর ঠিক খুবতে পারবি না।'

আবার কোঁ-কোঁ করলে টিটু, যেন মিশার কথার প্রতিবাদ করল।

বব জিজেস করল ববিনকে, 'চুরি হয়ে যাওয়া মেডেলগুলোর পরিবর্তে আর নতুন মেডেল দেয়নি সরকার?'

'না, তা কী আর দেয়। দেয়ার নিয়মও নেই, সম্ভবও না। তা ছাড়া কিছু মেডেল তিনি পেয়েছিলেন বিদেশী সরকারের কাছ থেকে। অনেকই তো খুব সাহসী যোক্তা ছিলেন তিনি। তাঁর মত একজন মানুষকে এ-ভাবে কাঁদতে দেখে খুব খারাপ লেগেছে আমর। খুব ক্ষতি করে দিয়েছে চোরটা। মেডেলগুলো তাঁর কাছে খুব মেডেলই ছিল না, ওহলো দেখে দেখে পুরানো দিনের কথা ভাবতেন তিনি। জিনিসগুলো খুঁজে বেঁকে করে আবার তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলে খুব খুশি হতাম।'

মন খারাপ করে বসে আছে ভলি আর অনিতা। দেখে মনে হচ্ছে, জেনারেলের দুঃখে ওরাও কেন্দে ফেলবে।

'মেডেলগুলো খোঁজা উচিত আমাদের,' হঠাতে জোর গলায় বলে উঠল ভলি। 'কিভাবে করব জানি না, তবে অন্তত চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'অথবা, কেবল লাভ হবে না,' কিশোর মাথা নাড়ল। 'দু-তিন বার ঘন ঘন চিমাটি কাটল নিচের ঠোঁটে। 'বের করার কোন উপায়ই দেখছি না আমি। তারচেয়ে বরং অন্য কাজ করি, চলো।'

'কি কাজ' মুসা জানতে চাইল।

'এখন পাখিদের বাসা বাঁধার সময়। তিম পাঢ়বে। ত্র্যামলি উড়সে চলে যেতে পারি আমরা। অনেকি, দুটি ছেলেরা গিয়ে ওখানে পাখির বাসা ভাঙে, তিম চুরি করে, বাচ্চা মেরে ফেলে। ওদেরকে বাধা দিতে পারি আমরা, বাসা যাতে না ভাঙে। আমরা সাতজন, দলটা নেহাত হোটি না। তা ছাড়া টিটু তো রয়েয়েই।'

'হফ!' যেন সব খুবতে পেরে কিশোরের সঙ্গে একমত হলো টিটু।

অলোচনা চলল। ওরা ঠিক করল, একই সাথে দুটো কাজ হাতে নেবে ওরা।

জেনারেলের মেডেলও খুঁজবে, পাখির বাসার ওপরও নজর রাখবে।

'করতে পারলে তো ভাল হত,' বব বলল। 'কিন্তু একসাথে কি দুটো কাজ সম্ভব? পারব?'

'চেষ্টা করতে দোষ কি?' মিশা বলল। 'পারতেও পারি। কাজে না নামলে জানব কিভাবে!'

## তিন

আর বেশিক্ষণ বাগানে থাকতে পারল না ওরা। কারণ, ডাক শোনা গেল যখন থেকে।

'চাটি, ভাকচেন।' খড়ি দেখব কিশোর। মিশা, এবার যাওয়া দরকার। এত বেজে গেছে খেয়ালই করিন। মাটিটঙ্গ বসলে কিভাবে মে সময় কেটে যায়!

'ভা ঠিক,' একমত হলো বব। 'কিষ্ট কিশোর, আমাদের কথা এখনও শেষ হয়নি। কিভাবে কী করছি আমরা? জেনারেলের কাছে কারণ যাওয়া দরকার। মেডেলগুলো সম্পর্কে আরও খোজ খবর নিতে-করে চুরি হয়েছে, কিভাবে, এসব।'

'হ্যা, ঠিকই বলেছে। ববিন যাবে। ওদের পাশের বাড়িতেই থাকেন যখন। কি রবিন, পারবে না?'

'পারব। কিন্তু এত কথা জিজেস করলে আবার কী মনে করেন...

'মনে করবেন কেন?' ভলি বলল। 'তিনি তো তোমাকে চেনেনই। তাঁর সামনে খুব দুঃখ করতে থাকবে-সেটা তুমি ভালই পারো। মন গলিয়ে ফেলতে পারলে জবাব না দেয়ার তো কোন কারণ দেখি না।'

'আর আমরা যাব পাখির বাসা পাহারা দিতে,' কিশোর বলল। 'একসাথেও যেতে পারি, আলাদা হয়েও যেতে পারি। একলা গেলে ব্যাজ পরে যাব। কেউ জিজেস করলে বলব, তাবের তরফ থেকে অর্ডার আছে আমাদের ওপর পাখির বাসা পাহারা দেয়ার জন্যে।'

'লোকের নামধার্ম জিজেস করতে হবে না তো?' শক্তি হয়ে বলল অনিতা।

'বাসার কাছে কাউকে ঘুরঘূর করতে দেখলে ইচ্ছে হলে নাম-ঠিকানা জিজেস করতে পারো, অসুবিধে কি? জিজেস করলেই যে বলবে, তা না-ও হতে পারে,

বিশেষ করে বড়ো। তবে দুষ্ট ছেলেরা চমকে যাব। ইদনীনি পাখি নিয়ে পত্ৰ-পত্ৰিকায় এত বেশি লেখাৰেখি, হৈ-হৈ হচ্ছে, সতৰ্ক হয়ে গেছে পুলিশ। বাসা যাতে নষ্ট না কৰা হয়, এ-বাপোৱে অনুৰোধ জানানো হয়েছে সবাইকে।'

'একা গিয়ে সুবেধ কৰতে পাৰো না,' মুসা বলল। 'তাৰচোৱে বৰং দুতিনজন একসময়ে যাই। একলা গোল পাতাই দেবে না আমাদেৱকে শয়তান ছেলেগুলো।'

ঠিক আছে,' রাজি হলৈ কিশোৱ। দায়িত্ব তাৰলে তোমার ওপৰই থাকল। কাকে কাকে নেবে, কিভাবে যাবে, সেটা তুমিই ঠিক কৰো। চাৰদিনেৰ মধ্যে রিপোর্ট কৰবে। আৱ আগৈই যদি মীটিতে বসতে চাও, একটা নোট কৰে যাবে ছাউনিত। আমাৰ কিংবা মিশাৰ চোখে পড়বেই। কাৰণ রোজই আমাৰ একবাৰ কৰে দু মেৰে যাব।'

'আচ্ছা,' মুসা বলল। 'ওই যে, আতি আৰাব ডাকছেন। চলো, উঠ। নইলৈ বকা যাবে তোমোৱ।'

ছাউনি থেকে নেৰিয়ে যাব বাড়িৰ দিকে চলে গেল কিশোৱ আৱ মিশা বাদে বাকি পাংচজন। কিশোৱ দৱজা বক কৰল। তাৰপৰ মিশা ও টিচুকে নিয়ে ঘৰেৰ দিকে রওনা হোৱা।

ৱানুাঘৰেৰ দৱজায় পা দিতেই বলে উঠল ডজেৱ বউ বেৰি, 'এন্ত দেৱি কৰলে। ম্যাডাম রেগে গেছেন। কৰন থেকে খাবাৰ নিয়ে চৌবিলে বসে আছেন। জলনি যাও।...আৱে ওভাৰে যাছে কেন? হাতমুখ ধুয়ে যাও...'

ইঠতে ইঠতে বাড়ি চলেছে রবিন। মনে ভাৰবাৰ ভিড়। জেনারেলকে জোৱা কৰাৰ পৰু দায়িত্ব তাৰকে দেয়া হোৱা। যদি তিনি রেগে যান? ভাবেন, বাচাল হোঁড়া? অনেকবাৰ রেগে তাঁকে চিকিৎস কৰতে আনেছে সে। এই তো, গত পৰত মোসারি শপেৰ মালিকেৰ ওপৰ এমন রাগা রাগলৈন! যদি বেৰ কৰে দেন রবিনকে? কিংবা ওদেৱ বাড়িতে নালিশ কৰেন তাঁকে বিৰক্ত কৰেছে বলে?

'দূৰ, যা হয় হবে,' আপনমনেই হাত নেড়ে নিজেকে সাহস জোগাল রবিন। 'কোৱে তৱফ থেকে আমাকে একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, পালন কৰতেই হবে। কিন্তু কিভাবে? জেনারেলকে না রাগিয়ে কী কৰে...?'

ৱাতে বিছানায় ওয়েও ব্যাপৱটা নিয়ে অনেক ভাবল। ঠিক কৰল, অগ্রামী সকালে জেনারেল যখন মৰিং ওয়াক সেনে বাড়ি ফিৰিবেন, দেয়ালেৰ ওপৰ দিয়ে একটা বল বাগানে ঝুঁড়ে ফেলবে সে। তাৰপৰ সেটা ফেৰত আনাৰ ভান কৰে দেয়ালে উঠে বসবে। ওখান থেকেই বলবে, খাপ কৰবেন, স্যার, বলটা শেডে

গেল। চুকব?' তাৰ ধাৰণা, জেনারেল অমত কৰবেন না। 'আৱ চুকতে পাৰলৈই,' তৃতীয় বাজাল সে, 'কথায় কথায় আসল আলোচনায় চলে যাব। হ্যাঁ, তাই কৰো।'

সুতৰাং পৰদিন সকালে একটা বল নিয়ে তাৰ শোবাৰ ঘৰেৰ জানালায় তৈৰি হয়ে বসল রবিন। অপেক্ষা কৰছে জেনারেলোৰ জন্যে।...হ্যাঁ, ওই যে তিনি এলেন।...বাগানে চুকলোন।...হ্যাঁ, এইবাৰ সময় হয়েছে...

একটুটো নিচে নেমে রান্নাঘৰ দিয়ে বাগানে বেৱিয়ে এল রবিন। জেনারেলোৰ বাগানটা তাৰ চেন। কোথায় কোন গাছ আছে জানে। অনুমানে একটা ঘন ঝোপ সহি কৰে দেয়ালোৰ ওপৰ দিয়ে বলটা ঝুঁড়ে মারল। কয়েক সেকেন্ড বিৰতি দিয়ে উঠে বসল দেয়ালে।

বাগানেৰ পথ ধৰে এগিয়ে আসছেন জেনারেল।

'ওড মৰিং স্যার,' ডেকে বলটা রবিন।

'কে? ও, রবিন। ওড মৰিং।' তাৰ দিকে তাকিয়ে চোখ পিটাপিট কৰলেন জেনারেল। 'সুল নেই?'

'না, স্যার, ছুঁট।' স্যার, আমি ঝুবই দুঃখিত। বল খেলছিলাম, দেয়াল টপকে আপনার বাগানে গিয়ে পড়ড়ে। বেৰ কৰে নেবে? গাছটাৰ নষ্ট কৰব না।'

'আৱে নাও নাও, এত তয় কৰছ কেন?' হাতেৰ লাঠিতে ভদ্র দিয়ে দাঁড়ালেন বৃক্ষ জেনারেল। 'ভাল ছেলেদেৱ কথনও বাগানে চুকতে নিবেধ কৰি না আমি। নেমে এসো। এক গ্রাস লেমোনেড খেয়ে যাও আমাৰ সাথে। খাৰে?'

আনন্দে নেচে উঠল রবিনেৰ মন। তবে সেটা চেহাৰায় ঝুটতে দিল না। একসাথে বসে লেমোনেড খাওয়া, তাৰমানে অনেক কথা বলাৰ সুযোগ পাওয়া যাবে। লাখিয়ে মাটিতে নামল সে। বলটা ঝুঁজে বেৰ কৰে নিয়ে এসে জেনারেলোৰ পিছন শিচন ইঠতে লাগল। বাড়িৰ দিকে চলেছেন তিনি।

কাছকাছি এসে চিকিৎস কৰে তাৰ রাধুলীৰ নাম ধৰে ডাকলেন, নোৱা! নোৱা! মেহেন আছে, আমাৰ সাথে। মুই গ্রাস লেমোনেড দাও, আৱ বিস্কুট।'

উকি দিল নোৱা। রবিনকে দেখে একটা চফকার হাসি উপহার দিয়ে গেল। খুদে সিটিংকুমটায় রবিনকে নিয়ে বসলেন জেনারেল। দেয়ালে ঝোলানো অসংখ্য ফটোগ্রাফ, জেনারেল আৱ তাৰ সৈনিক বস্তুদেৱ। সবই তাৰ সামৰিক জীবনেৰ ছবি। ম্যানটেল-শীসোৰ ওপৱটা বালি।

কেন খালি, জানে রবিন। ওখানেই ধাকত মেডেলগুলো।

সেদিকে রবিনকে তাৰিয়ে থাকতে দেখে নীৰ্মলাখাৰ কেললেন জেনারেল। ধীৱে ধীৱে বললেন, 'আমাৰ মেডেলগুলো চুৱ হয়ে গেছে, তনেছ নিষ্ঠয়। কত কষ্ট কৰে ৫-মেডেল রহস্য।'

যে পেয়েছিলাম ওগুলো! কত ঘাম, কত রক্ত ঘরিয়ে! আমার সৈনিক জীবনের চিহ্ন ওগুলো। আমি এখন বুঝতে হয়ে গেছি। গায়ে শক্তি নেই। ওই মেডেলগুলো দেখলে লোকে অস্ত বিশ্বাস করত, এককালে সিংহের মত লড়াই করেছি আমি। এখন আর করতে চাইবে না। ওগুলো নেই। কী সুবিধে ওগুলোর বিশ্বাস করাব...'।

গলা ধরে এল জেনারেলের। গাল বেয়ে গভীরে পড়ল দুক্কেটা ঢোকের পানি।

মন খারাপ হয়ে গেল রবিনের। এ-ভাবে মানুষটির পুরাণে ব্যাথায় পৌচ্ছে নিজেকে। অবেগ সামলাতে না পেয়ে খপ করে জেনারেলের কোটের হাতা খামচে ধরে কোন চিঞ্জ-ভাবনা না করেই কথা দিয়ে ফেলল, 'স্যার, আপনার মেডেলগুলো আমি খুঁজে বের করে দেব।। কান্দবেন না, স্যার, আমি কথা দিছি, যেভাবেই পারি ওগুলো খুঁজে বের করবই।'

এমনভাবে বলল রবিন, কান্না ভুলে পিয়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন জেনারেল। অবাক রাবিন নিজেও হয়েছে। শক্ত করে রাবিনের হাত ঢেপে ধরে বাঁকিয়ে দিলেন জেনারেল। বললেন, 'হ্যা, হ্যা, পারবে। তুমিই বের করতে পারবে। তোমার কথা তবে এত ভাল লাগছে যে কী বলব। একদিন তুমি আমার হারানো মেডেল খুঁজে এনে দিতে পারবে।...কে, নোরা? কী চাও? মেহমান এসেছে দেখছ না?'।

'হ্যা, স্যার। আপনি আবার মেডেলের কথা ভেবে মন খারাপ করছেন,' কোমল গলায় বলল নোরা। 'ছেলেটাকে হেঢ়ে দিন, বাড়ি চলে যাক। আপনি ঘুমোন। সারারাত ঘুমোননি, খালি ছফ্টফট করেছেন। তবে পড়ুন এখন।'

আর ওখানে থাকা উচিত মনে করল না রবিন। জেনারেলকে বিদ্যা জানিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে চুকে পড়ল রান্নাঘরে। নোরার আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে চুকল নোরা। রবিনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ও তুমি, যাওনি এখনও। মেডেলগুলোর কথা বলা একদম উচিত হ্যানি তোমার। এমনিতেই দিনরাত ওগুলোর কথা ভাবেন। তার ওপর কেউ মনে করিয়ে দিলে তো আর কথাই নেই।'

'কে চুরি করেছে, পুলিশ কি জানে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'না। আমরা তখুন জানি, একরাতে চোর চুকে সবগুলো মেডেল চুরি করে নিয়ে যেছে। আঙুলের ছাপ রেখে যায়নি। আবেক্টা কথা জানি, চোরটা ছেলেমেয়ে যাই হোক, হাত খুব ছেট। কারণ জানালার কাচের যে ভাঙা ফোকর দিয়ে হাত

চুকিয়ে ছিটকানি খুলেছে, সেটা খুবই ছেট। এত ছেট, তোমার হাতও চুকরে কিনা সন্দেহ।'

'ওই মে, ওটা, হাত ভুলে দেখাল নোরা।

'মেধি তো চেটা করে।' পারল না রবিন। চাপাচাপি করে ঢোকাতে গেলে হাত কেটে যাবে। 'মনে হচ্ছে, ছেট কোন মেয়েই তখুন ওখান দিয়ে হাত চুকিয়ে ছিটকানি খুলতে পারবে। কিন্তু ওরকম একটা মেয়ে মেডেল চুরি করতে আসবে কেন?'।

'সেটাই তো রহস্য,' নোরা বলল। 'দুটু খে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে মানুষটার। বেশ ভাল একটা পুরুষকারও ঘোষণা করেছেন, পাঁচশো ডলার, কম না। ভেবেছিলেন কেউ পুরুষকার নিতে এগিয়ে আসবেই। এল না। তবে আপনি ছাড়তে পারছেন না। ভাবছেন একদিন না একদিন কেউ আসবেই।'

'পাঁচশো ডলার! এ-তো অনেক টাকা! ইস, মেডেলগুলো যদি পেতাম কোনভাবে। তবে পেলে এমনিষি দিয়ে দিতাম, টাকা নিতাম না।'

'তুমি খুব ভাল হচ্ছে।'

'যাকে ইট।'

রবিন ভাবল, যাক, পরের মিটিঙে বলার মত কিছু পাওয়া গেল। তবে রহস্যের সমাধান করার মত তেমন কোন সূত্র পায়নি। তখুন জেনেছে, ছেট একটা ফোকর হাত চুকিয়ে ছিটকানি খুলেছে চোর। এত ছেট ফোকর, একটা বাচ্চা মেয়ের হাতই কেবল ওপরে ঢোকানো সহজ। আর রবিনের বিশ্বাস, এত ছেট মেয়ে মেডেল চুরি করতে আসবে না। করেছে বড় মানুষ। তাদের হাতও অনেক বড়। ফোকর দিয়ে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে করল কে?

তাবৎ তাবৎে বাড়ির দিকে চলেছে রবিন। ঘড়ি দেখল। সেশি বাজেনি। এখনও নিয়ে ত্র্যামলি হিলে লধনদের পাওয়া যাবে, যদি খুঁজে বের করতে পারে ওদের। টিক কোথায় আছে কে জানে।

নিজেদের বাড়িতে চুকে রান্নাঘরে উকি দিল রবিন। মা কাজ করছেন। 'মা,' অনুরোধ করল সে, 'কয়েকটা স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেবে? ত্র্যামলি উডসে যাব। মুসুরা ব্যয়েছে ওখানে।'

'বানিয়ে নে না,' মা বললেন, 'আমার হাত ব্যব। ওই ওখানে বনকুটি আছে। মাখন, মাংস সবই আছে...চাইলে কিছু বিস্কুটও নিতে পারিস...'।

মেডেল রহস্য

'ওহ মা, তুমি যে কী ভাল না!' পিছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরে জোরে এক ঘোরুনি দিল রবিন। তারপর উঠল তাকের দিকে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে খাবার ডরা হয়ে পেল তার।  
বেরিয়ে পড়ল বাঢ়ি থেকে। বক্সের খুঁজে পেলেই হয় এখন।

## চার

রবিন যখন জেনারেলের সঙে কথা বলছে, মুসা তখন অনিতা আর ববকে নিয়ে চলেছে ত্র্যামলি উড়সে। ওখানে পিকনিক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা। একই সাথে চোখ রাখতে পারিব বাসার ওপর।

'কাজও হবে, মজাও হবে,' মুসা বলল।

'আমার ভয় লাগছে,' অনিতা বলল। 'যদি সত্যি সত্যি কেউ বাসা ভাঙতে আসে? কী করে ঠেকাব? ওরা ভীষণ পাঞ্জি...'

'সে-ভার আমাদের ওপর হেঢ়ে দাও,' বুকে খাবা দিয়ে বলল বব। 'তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখবে...আরে, কেকিল!'

'চিল মারো, চিল মারো!' অনিতা বলল।

'কেন?' আবাক হয়ে জানতে চাইল মুসা।

'কেন আবার। জানো না, কোকিলেরা অন্য পাখির বাসার ডিম ফেলে নিয়ে সেখানে ডিম পেড়ে আসে? সেই ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায় অন্য পাখি, কোকিলের কোন কষ্ট নেই। সে শুধু ডিম পেড়েই খালাস।'

'তাই নাকি? আশৰ্ব! জানতাম না তো। দারুণ বুদ্ধি ব্যাটাদের। নিজেদের কেন কষ্টই নেই।'

'কুকু! কুকু! কু-উ-উ-উ!' ডেকে উঠল পাখিটা।

একটা চিল কুড়িয়ে নিয়ে ঝোপ সই করে ছুঁড়ে মারল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, 'ঘ, ভাগ! যদি তোর এই চোরামি ধরতে পারি, অন্যের বাসায় বসে থাকতে দেবি, সোজা ডিমগুলো তুলে নিয়ে দেবে ফেলব! ভাগ, ভাগ!'

ঝোপ থেকে উঠে নিয়ে উঁচ গাছের ডালে বসল পাখিটা। তারপর হেল মুসাকে ব্যবস্থ করেই আবার ঢেকে উঠল, 'কু-উ-উ-উ!'

ববের ভিতর আর কারও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে বস্তি দোখ করছে

অনিতা। মুদ্রর এই সকালে পাখির বাসা ভাঙা নিয়ে কারও সাথে ঝগড়া বাধাতে ইচ্ছে করছে না তার। বনের ভিতর ঘূরতে লাগল ওরা। অনেক প্রিমরোজ ফুলে তুলে নিল অনিতা।

'অনেক তো ঘূরলাম,' একসময় বলল সে। 'এবার একটু জিরিয়ে নিলে কেমন হয়? বসে আপেল খেতে খেতে পাখির গান শন'।

কথাটা অন্য দুজনেরও পছন্দ হলো। একটা জায়গা বেছে নিয়ে মাটিতেই বসে পড়ল। 'কথা শোনা গেল' এই সময় গাছের আড়াল থেকে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল ভিনজন কিশোর, ওদেরই বয়েসী। ওদের দেখতে পায়নি। সোজা শিশি দাঁড়াল একটা গাছের নিচে। হাত তুলে ওপর নিকে দেখাতে লাগল একজন।

'এই, নিচয়ই বাসা দেবেছে!' ফিসফিসিয়ে বলল অনিতা।

'মনে হয়,' মাথা ধীকাল বৰ।

ঠিকই অনুমান করেছে ওরা। গাছ বেয়ে উঠতে ভুক করল একটা ছেলে। উঠে পাতার ঝাঁকে কিছু দেখে নিয়ে চিকার করে নিচের বক্সের বলল, 'ঝাঁকবার্ডের বাসা! চাটটে ডিম আছে! সব নিয়ে আসব?'

'তিনটো আন,' নিচ থেকে জবাব দিল একজন। 'প্রতোকের জন্যে একটা করে।'

'এসো, যাই,' উঠে দাঁড়িয়ে বকে বলল মুসা।

ছেলেদের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ভ্রতাবে মুসা বলল, 'এই শোনো, তোমরা নিচয় জানো পাখির ডিম নষ্ট না করতে অনুরোধ করা হয়েছে আমাদের। গত বছর এত বেশি নষ্ট করা হয়েছিল, তাই পেরে এই এলাকা ছেড়েই চলে পিয়েছিল পাখিদের। এ-বছর আবার কিছু আসতে ভুক করেছে...'

'আহারে, কী পক্ষি প্রেমিক আমার!' জোরে হেসে উঠল একটা ছেলে। 'একেবারে পদ্মী সাহেবের মত কথা বলছেন। নেবি, একটা ডিম দে তো ওকে।'

বাসা ধোকে একটা ডিম বের করে মুসার মাথা সই করে ছুঁড়ে মারল গাছের উপরের ছেলেটা। ডিমটা ডেকে মুসা চুল আব গাল বেয়ে গড়তে লাগল।

'দাড়া, দেখছি মজা!' মাথা ধোকে ডিম মুছতে মুছতে দাঁকে রাখে চেঁচায় উঠল মুসা। হাত বাঢ়িয়ে ভালে বসা হেলেটোর পা চেপে ধরে নিল হাঁচকা টান। টানের চোটে একেবারে মুসার গায়ের ওপর এসে পড়ল ছেলেটা। মুসাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে। গড়াগড়ি ভুক করল দুজনে। একে অন্যের বুকের ওপর চেপে বসার চেষ্টা চালাল।

চোমেটিতে ভয় পেয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গেল একটা ব্রাকবার্ড।  
'গেয়েছি!' বল উঠল তৃতীয় আরেকটা ছেলে। 'আরেকটা বাসা আছে!  
এসো, দেখি,' সঙ্গীর হাত ধরে টান দিল সে। এবার ওদেরকে ঠেকাতে এগিয়ে  
এল বু।

মরিয়া হয়ে উঠল অনিতা। আরেকটা বাসার ডিম নষ্ট হবে তার চোখের  
সামনে, এটা সহ্য করতে পারল না সে। রাগে ফোড়ে চিকির করে উঠল, গলা  
কাঁপছে তার, 'জানো, আমরা একটা ক্লাবের মেঘার! এ-সব অসৎ কাজ বন্ধ করতে  
বলা হয়েছে আমাদের! এই যে আমাদের ব্যাজ! তাল চাইলে চলে যাও!'

ভুক ঝুচতে তার ব্যাজের দিকে তাকাল ছেলে দুটো। তারপর হো হো করে  
হেসে উঠল। একজন বলল, 'এই দেখ্ দেখ্, ব্যাজ! হা হা! ব্যাজ! এই খুলে নাও  
গুটা, বাসায় রেখে দিই। ডিমের বদলে ঘটাতেই তা দিয়ে ছানা ফেটাক পাখিরা।  
হাহ হাহ!'

অনিতার ব্যাজ কেড়ে নিতে গেল ছেলেটা। সেটা ঠেকানোর জন্যে অনু  
ছেলেটার হাত ছুটিয়ে উঠে এল মুসা। এগোনোর আগেই পা ধরে টান মেরে  
আবার তাকে ঘাসের ওপর ফেলে দিল ছেলেটা।

চিৎকার করে বলল মুসা, 'অনিতা, দৌড় দাও! সবে যাও এখান থেকে!' তার  
ভয় হচ্ছে, অনিতাকেও মারতে আরম্ভ করবে শয়তান ছেলেগুলো। ততক্ষণে বেরে  
সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেছে অনু ছেলে দুটোর।

তার অনিতা পেয়েছে। দিল দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে এক জায়গায় এসে  
দেখল গাছে নিচে বেই পড়ছ একজন লোক।

একটা মেয়েকে ওভাবে দৌড়াতে দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা।  
অনিতাকে ধামাল। জিঞ্জেস করল, 'কি হয়েছে? ওরকম দৌড়াছে কেন?'

'জলনি আসুন! বাঁচান!' অনুন্দন করে বলল অনিতা। 'পাখির সমস্ত ডিম নষ্ট  
করে ফেলছে পাজ ছেলেগুলো! আমরা বাধা দিতে গিয়েছিলাম বলে...'

'কোথায়? চলো তো দেখি,' লোকটা বলল।  
মৌড়ে ফিয়ে চলল অনিতা। লোকটা চলল তার সঙ্গে। বব আর মুসার  
কুক্ষুর কানে আসছে। চোমেটি করছে অন্য ছেলেগুলোও।

একজন বয়স্ক লোককে হাঁটা আসতে দেখে সাহস পেল বব আর মুসা।  
ওদের বুকের ওপর চেপে বসে আছে দুটো ছেলে। বোবা যায়, ওরাই জিতাছে।

কাছে এসে ধমক দিয়ে লোকটা বলল, 'এই ওটো, ওটো গায়ের ওপর থেকে।  
জানো না, পাখির ডিম নষ্ট করা বেআইনী। পুলিশকে গিয়ে বললেই এখন কাক

করে এসে কান ঢেপে ধরবে। নাম বলো জলনি, ধানায় রিপোর্ট করব। এই ছেলে,  
কী নাম তোমার?'

মুসার গায়ের ওপর বসা ছেলেটাকে ধরে টান দিয়ে সরিয়ে আনল লোকটা।

তা পেয়ে পেল তিনি ডিম-শিকারী। আড়া দিয়ে লোকটার হাত ছাড়িয়ে  
নিয়েই দৌড় দিল মুসার গায়ের ওপর বনেছিল যে ছেলেটা। অন্য দুজনও দাঢ়িয়ে  
থাকল না। সঙ্গীর পদাঙ্গ অনুসরণ করল।

দাঢ়ি-ঘ উঠে কাগড় থেকে ধূলো-ময়লা ঝেড়ে ফেলতে শুরু করল বব আর  
মুসা।

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুসা বলল, 'ডিম নষ্ট করতে নিয়ে থেকে করেছিলাম।  
আমাদের সঙ্গে দেলে পেল।'

'নিশ্চয় কোন ক্লাবের মেঘার তোমার,' মুসার ব্যাজের দিকে তাকিয়ে বলল  
লোকটা।

মাথা দাঁকিয়ে সায় জানুল বব।

'ধূর ভাল,' বলল লোকটা। 'পাখি আমিও ধূর ভালবাসি। আমিও চাই ওদের  
বাস নেই না হোক। অনেক বাসা আছে এই বনে। ইতিমধ্যেই চাইপ্পটার মত  
দেবে ফেলেছি আমি।'

'কিন্তু ওদের ডিম তো চুরি করেন না আপনি, তাই না?' অনিতা বলল।

'না না, কী বলো, ডিম চুরি করব কেন? গত কয়েক বছর ধরেই পাখির বাসা  
নিয়ে গবেষণা করছি আমি, একটা বই লিখে বলে।'

'তাই নাকি?' মজার লোক, ভাবল মুসা। এই লোকের সঙ্গে আলাপ করতে  
ভাল লাগবে। তা আসুন না, আমাদের সঙ্গে থেয়ে নিন। অনেক খাবার আছে।  
চারজনের হয়ে যাবে। খেতে খেতে আপনার কথা শুনব।'

'খাবার আমার কাছেও আছে,' পকেটে হাত চুকিয়ে কাগজের একটা প্যাকেট  
বের করল লোকটা। 'স্যান্ডউইচ। ঠিক আছে, এসো, বসে যাই। তোমাদের খাবার  
থেকে আমি ভাগ নেব, আমার খাবার থেকে তোমার। ভালই হবে। ওই যে ওই  
ঘাসগুলোর ওপর বসি। তোমাদের ক্লাবের কথা শুনব।'

ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে খাবারের প্যাকেট খুলল ওরা।  
খাওয়ার সময় তখনও হয়নি, তবু কোন কারণে—হয়েতো পরিশ্রম করেছে বলেই  
খিদে পেয়ে গেছে ওদের।

স্যান্ডউইচ চিবাতে চিবাতে লেমোনেডের বোতলে চুমুক দিল অনিতা।  
'ভাগিস, আপনি কাছাকাছি ছিলেন,' লোকটাকে বলল বব, 'নইলে মার  
মেডেল রহস্য।'

খেতে হত আমাদের। ওরা তিনজন, গায়েগতরেও আমাদের চেয়ে বড়। মারও খেতাম, ডিমঙ্গলোও বাঁচাতে পারতাম না। আবু আমাদের ব্যাজগুলোও ছিনয়ে নিতো।...ও, আমাদের ক্লাবের কথা শুনবেন বললেন। তবুন্মু...'

বেশ গবের সঙ্গে লধশদের কথা বলে গেল বব, মুসা আর অনিতা।  
আপু লোকটা ও খুব ভাল শ্রোতা। বেশ অগ্রহ নিয়ে অনে যাচ্ছে চুঁ টপ।

## পৌঁচ

'আমাদের ক্লাবটা তো ভালই মনে হচ্ছে,' লোকটা বলল। ব্যাজগুলোও সুন্দর। নিজেরাই বানিয়েছ বুঝি?

'মেরের বানিয়েছে,' বব জানাল। 'কিশোরদের বাগানের একটা ছাউনিতে আমাদের হেডকোয়ার্টার। তার দরজায় বড় বড় করে লিখে দিয়েছি লধশ।'

'লধশ' কি, অনেক কষ্টে বোঝাল মুসা। কারণ শব্দটা বাংলা, ইংরেজীভাষার লোকটার বুঝতে অসুবিধে হলো।

'আমরা মানুষকে সাধামত সাহায্য করি, যারা বিপদে পড়ে,' অনিতা বলল। 'কোন রহস্য পেলে তার সমাধানের চেষ্টা করি....'

'তাই নাকি! এখন কী রহস্যের সমাধান করছ?' জিজেস করল লোকটা। 'ওহ্হো, আমার নামই তো বলিনি এখনও। আমার নাম ডেরিক, হেনরি ডেরিক। হেনরি বলে ডাকলেই চলবে। মিস্টার-ফিস্টারের দরকার নেই।'

'ঠিক আছে,' মুসা বলল। 'আপনি মাইক না করলে বলব।'

'বেশ,' হেনরি বলল, 'এখন বলো তো, পাখির ডিম বাঁচানো ছাড়া এ-মুহূর্তে আর কী কাজ করছ তোমরা? জিটল কোন রহস্য-টহস্য...'

'হ্যাঁ, চেষ্টা একটা করা হচ্ছে,' মুসা জানাল। 'দলের এক সদস্য, রবিন, ওদের বাড়ির পাশের একজনকে সাহায্য করতে গেছে। অন্দুলোকের বাড়িতে হঠাৎ হয়েছিল।'

'কৌতৃহল হচ্ছে শোনার,' একটা বনরুটি নিল হেনরি। 'অন্দুলোকটি কে? তোমরা যে সাহায্য করছ এ-কথা তিনি জানেন?'

'হয়তো একক্ষণে জেনে গেছেন। আমরা যখন বনের দিকে রওনা হয়েছি, রবিনের তখন ওই বাড়িতে যাবার কথা। জেনারেল জেমস মরিসনের নাম নিষ্ঠা

অনেছেন, আর তার মেডেলের কথা?'

অবাক মনে হলো হেনরিকে। 'জেনারেলের মেডেল চুরি গেছে? উনি তো বিখ্যাত লোক! ওগুলো ঘুঁজে বের করার চেষ্টা করছ নাকি তোমরা?'

'হ্যাঁ। আগামত রাবিন করছে। তবে কেন সুত্র পেলে চলে আসবে। মাটিতে বসব আমরা। সবাই মিলে তার সমাধানের চেষ্টা করব,' বলল বব।

'ভাল বুঝি বের করেছে তো তোমরা। তা কী মনে হচ্ছে? মেডেলগুলো বের করতে পারবে?'

'পারলে তো খুবই ভাল হত। অনেছি জিমিসঙ্গলোর জন্যে পাঁচশো ডলার পুরকারও যোগাগ করা হয়েছে। আজ সকালে ডাক পিয়ানের সঙ্গে দেখা। সে-ই জানাল বুঁকটা।'

'তাই নাকি?' পিঠ সোজা হয়ে গেছে হেনরির। 'পুরকারটা পেলে কী করবে ওই টাকা দিয়ে?'

'টাকা দেবই না,' অনিতা বলল। 'মেডেল পেলে দিয়ে দেব, কিন্তু টাকা দেব না। অনেছি জেনারেলের দিন এখন খারাপ যাচ্ছে। টাকার খুব টানটানি। মেডেলগুলো হারিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছেন, মন খারাপ করে থাকেন সারাদুর্বল।'

ঠিক এই সময় কানে এল জোর চিৎকার: মুসা! বব! কোথায় তোমরা?

'আরে, রবিন মনে হচ্ছে!' অনিতা বলে উঠল। 'নিষ্ঠায় জেনারেলের সঙ্গে দেখা করে কিছু অনেছে, আমাদের বলতে আসছে। আহ্হা, যাবারও তো সব শেব করে ফেললাম, জবাব দাও, জবাব দাও!'

আর মিনিটের মধ্যেই ওদের কাছে চলে এল রবিন। হাতে প্লাস্টিকের বাগ। পরিশেষে মুখ লাল। তবে বকুদের ঘুঁজে পেয়ে চওড়া হাসি ফুটেছে মুখে। ওদের সাথে অপরিচিত লোক দেখে অবাক হয়ে গেছে।

'চিঙ্গা নেই,' ওরা খেয়ে ফেলেছে তনে রবিন বলল। 'যাবার আমি নিয়ে এসেছি। তবে পানি আনতে মনে নেই।'

একটা বোতল বের করে দিল বব। 'অনেক লেমোবেড এনেছি। রবিন, চলে এলে যে? জেনারেলের ওখানে যাওনি?'

'গিয়েছিলাম।' হেনরির দিকে তাকাল রবিন। আবার ববের দিকে ফিরল। 'ইমি?'

'হেনরি ডেরিক,' পরিচয় করিয়ে দিল বব। 'ওনার জন্যেই আজ মার যাওয়া থেকে বেঁচেছি আমরা। ডিম চুরি করেছিল তিনটে ছেলে, আমরা বাধা দিতে গেলে

মেডেল রহস্য।

৭৩

হামলা করে বসল। সে যাকগে। জেনারেলের কাছ থেকে কী জেনে এলে?’  
আবার হেনরির দিকে তাকিয়ে খিল করল রবিন।

‘কিছু হবে না, বলো,’ রবিনের মনের কথা বুঝতে পারল ব্যব। ‘লক্ষণের  
কথা ওনাকে সব বলেছি। সব জানেন। জেনারেলের মেডেল চুরির কথাও। বলে  
ফেলো, কী জেনে এসেছ? আমরা তাকে সাহায্য করতে পারব?’

প্রাস্টিকের ব্যাগ খুলে একটা স্যাভটাইচ বের করে কামড়  
বসাল রবিন। কিছুক্ষণ চিবিয়ে নিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, দেখা  
করেছিলাম। দেখা করে বোধহয় আরও ক্ষতিই করে দিলাম  
তার। মেডেলগুলোর কথা তুলতেই কানতে শুরু করলেন।  
এত খারাপ লাগল না আমার তখন! তার কানা দেখে বোকার  
মত কথা দিয়ে বসলাম। সামলাতে পারিনি নিজেকে, কী যে  
হয়ে গেল তখন!’

‘কি বলেছ?’ মনু জানতে চাইল।

‘বললাম, তার জন্যে আমার খুব দুর্বল হচ্ছে। মেডেলগুলো আমি খুঁজে বের  
করে দেব যেভাবেই হোক। কেন্দ্র যে বললাম! একেবারে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি।  
কাউকে কথা দিলে সে-কথা তো রাখতেই হ্যাঁ...’

‘বোকামিহি করেছ?’ অনিতা বলল। ‘এ-ভাবে কথা দিয়ে উচিত হয়নি। জানে  
যখন, রাখতে পারবে না। তবে আমার মনে হয় না তিনি বিশ্বাস করেছেন।’

‘সেটাই তো সবচেয়ে বারাপ লাগছে। তিনি বিশ্বাস করেছেন। মনে হলেই  
খারাপ লাগে। দূর, খিদেই নষ্ট হয়ে গেছে।’

‘এত মন খারাপ করার কিছু নেই,’ সার্জনা দিয়ে বলল মুসা। ‘বেয়ে নাও।’

‘মেডেলগুলো ছিল একটা লম্ব বারে, এভটুর্স,’ হাত দিয়ে বাক্সটা কর বড়  
দেখাল রবিন। ‘দেয়ালের কাছে রাখা ছিল তো। দাগ হয়ে গেছে। দেখেই আন্দজ  
করা যায় বাক্সটা সাইজ। তোর ধরার মত কোন সূর্য পাইনি। শুধু জেনেছি,  
জেনারেল কাঁচের ভাণ্ডা ফোকর দিয়ে হাত ঢিকিয়ে ছিটকানি খেলা হয়েছে।  
ফোকরটা এত ছেট, খুব ছেট মানুষের হাত ঢুকবে।’

‘শুধু শুধু এটুকুই?’ ইঠার জিজেস করল হেনরি।

‘হ্যাঁ।’ আবার স্যাভটাইচে কামড় দিল রবিন। ‘আমি মেডেলগুলো খুঁজে বের  
করে দিতে পারব, এ কথা বিশ্বাস করলেন জেনারেল। বললেন, ওগলো পেলে  
পাচশো ভোলা দেবেন আমাকে। কিন্তু কোথেকে দেবেন? তার কাছে অত টাকা  
আছে বলে মনে হলো না। চলছেন যে কিভাবে কে জানে।’

‘জিনিসগুলো কোথায় আছে জানতে পারলে হতো!’ রবিনের কথা ওনে  
অনিতারও মন খারাপ হয়ে গেছে। ‘কোথায় লুকানো থাকতে পারে, বলো তো?  
কে নিল?’

‘আমি বলতে পারব,’ ওনেরকে আবাক করে দিয়ে বলে উঠল হেনরি। ‘মানে,  
আন্দজ করতে পারি।’

হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ চারজনে। রবিন হেনরিকে  
জিজেস করল, ‘কোথায়, বলুন! আমাদেরকে বলতে না চাইলে পুলিশের কাছে  
পিয়ে বলুন।’

‘না, বলার বোধহয় তেমন কিছুই নেই,’ চোয়াল ডলল হেনরি। ‘তবু, আমার  
আন্দজের কথা বলি তোমাদের।’

‘বলুন, বলুন! উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না রবিন।  
‘তোমার বক্সদেরকে একটু আগে বললাম, পরিষ ভালবাসি আমি। আমার প্রিয়  
পুরানো গাছে অনেক পেঁচার বাসা। সেরাতে গাছের নিচে থেয়ে আকাশের তারা  
দেখছিলাম আমি, আর পেঁচার ডাক লেছিলাম, হঠাৎ...’

‘হঠাৎ কি?’ অবৈর্য হয়ে নামনে খুঁকে রবিন। ‘বলুন, ধামবেন না!’

‘হঠাৎ দেখি কে যেন চোরের মত একটা গাছের নিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পা  
টিপে টিপে,’ হেনরি বলল। ‘তার হাতে কিছু জিনিস। আমাকে দেখেনি। তবে সে  
কি করছিল, আমি দেখেছি, কারণ তার হাতে টর্চ ছিল।’

‘কি করছিল?’ নিঃখাস ফেলতে ভুলে গেছে যেন ব্যব।

‘একটা বাক নাড়াচাড়া করছিল, চামড়ার বাক্স। টর্চের আলোয় দেখেছি  
আমি। তারপর গাছের পাড়িতে একটা গর্ভের মধ্যে রেখে দিল বাক্সটা। কোন  
পারিয়ে বাক্সটাসা হবে গৱ্তা, কাঠটোকরার হতে পারে। বাক রেখে চলে গেল  
লোকটা।’

‘আপনি কী করলেন তখন? ডাকেননি লোকটাকে? দেখতে কেমন?’ প্রশ্ন  
করল রবিন।

‘বাকটা কি জেনারেলের মেডেলের?’ অনিতা জানতে চাইল।

‘জানি না। কোন ধরনের চামড়ার বাক্স, শুধু এটুকু দেখেছি। মেডেল রাখা  
যাবে ওভে।’

‘লোকটা চলে যাওয়ার পর নিচয় গিয়ে গর্ভের ভিতর দেখেছেন,’ ব্যব বলল।  
‘কি পেলেন?’

## জুড়া

'গতটা ঠিকই দেখেছি। তবে বাস্তু পাইনি। এত সরু, আমার হাত ঢোকেনি ভিতরে। অনেক চেষ্টা করেছি ঢোকানোর। কাজেই বাত্রে যে কী ছিল বলতে পারব না। হতে পারে মেডেল, হতে পারে অন্য কোন জিনিস। ছুরি করে এনেছিল।'

'মেডেল হলে এখুনি জেনারেলের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত,' রবিন বলল। 'চলুন চলুন, গাছটা দেখান। অনিতার হাত সরু, হয়তো চুকবে। চোরটারও হাত সরু, জানি আমরা। চালাকি করে ও এ-রকম কোন গতেই রাখবে, যেখানে মেটা হাত চুকবে না। গাছটা কোথায়?'

'কেন দেখাব তোমাদের?' ওদেরকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠল লোকটার কষ্টস্থর। 'পুরস্কারের ব্যাপারটা কী হবে, সেটা বলো আগে।'

'ওই পাঁচশো ডলার? নিচ্য আপনি সেটা চান না?' অনিতা বলল। 'জেনারেল এখন খুব অভাবে আছেন...'

'ওসব আমি শন্তে চাই না,' বাধা দিয়ে লোকটা বলল। 'টাকটা তোমাদের সঙ্গে বংশ ভাগভাগি করে নিতে পারি। চারপথে ডলার আমার, বাকি একশো তোমাদের। জলদি মন ঠিক করো। চোরটা যে কোন সময় ফিরে এসে বাস্তু বের করে নিয়ে যেতে পারে। তাহলে ওই একশেষেও যাবে।'

'আমরা একটা পয়সাও নেব না!' বাঁকাল কঠে বলল রবিন। 'গাছটা দেখান আমাদের। জলদি করুন! মেডেলগুলো বের করে নিই! কোথায় গাছটা?'

'বেশি দূরে না,' রহস্যময় হাসি হেসে বলল হেনরি। 'তবে এর বেশি আর কিছু বলছি না। আগে পুরস্কারের ব্যাপারটার একটা ফয়সালা হোক তারপর...'

'পুরস্কারের ফয়সালা একটাই,' মেঘে গিয়ে বলল রবিন, 'আমরা নেব না। আপনিও পাছেন না। যেভাবে চাপচাপি করছেন, এখন তো আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই চুরিতে আপনারও হাত কিনা!'

'কি বললে!' গজ্জে উঠল হেনরি। 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!' খালিক আগের ন্যূনত্বাত্মক লোকটার আচরণ এখন আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। তার মাঝে, পুরোপুরি বদলে গেছে। খপ করে রবিনের শাস্তারে কলার চেপে ধরল। কিন্তু বাড়া দিয়ে কলারটা ছুটিয়ে নিয়েই দৌড় দিল রবিন। চেঁচাতে লাগল, 'এই, পালাও, সব পালাও! লোকটা ভাল না!'

## অনিতা

সবচেয়ে বেশি তয় পেয়েছে অনিতা। ছেলেরা তয় যতখানি পেয়েছে তারচেয়ে রেখেছে বেশি। গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটছে আলাদা আলাদা হয়ে। বনের ভিতর থেকে বেরোনোর আগে থামল না।

বেরিয়ে এসে হ্যাঙ্গি যেতে পড়ল ওরা যাসের ওপর। কেউ চিত হয়ে, কেউ হাতের ওপর তর দিয়ে আধশোয়া হয়ে হাঁপাতে লাগল।

'লোকটা...আমাদের...ধরতে...আসবে না তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অনিতা।

'মনে হয় না,' মুসা বলল। 'এখনে লোক চলাচল বেশি। এদিকে এসে শয়তানী করার সাহস পাবে না। আচর্য! কে তাৰতে পেরেছিল, এভাবে হঠাৎ খেপে যাবে!'

'মেডেলগুলোর খোজ সত্য কি জানে ও?' ববের প্রশ্ন।

'মনে হয় জানে। আর গর্তের মধ্যে যদি সত্য সত্য হাত ঢোকাতে না পেরে থাকে, তাহলে বাস্তুও জায়গাগতই আছে এখনও। ওর হাতের থাবা দেখেছিন? বিবাট। পাখির গর্তে চুকবে না।'

'ওই চোরটার সঙ্গে তারও হাত রয়েছে, যা-ই বলো,' রবিন বলল। 'হেনরি তেরিকই হোক, আর যে নামই হোক, বাটো ঢোরের দলের লোক। পাখি দেখার নাম করে এদিকে যেৱাঘুরি করে, লোকের ওপর ঢোক রাখে, তাৰপৰ ছেটি হাতওয়ালা কাউকে দিয়ে চুরিগুলো করায়। তাৰ সাগদেরাই হয়তো ঢোরের ওপর বাটপাড়ি করে কিছু কিছু মাল এমন জায়গায় সরিয়ে রাখে, যেগুলো আৱ সে হাতাতে পারে না। আস্ত শয়তান। ওৱ কথার কোন বিশ্বাস নেই।'

এখন কী করা?' অনিতা বলল। 'ভয় লাগছে। বাড়ি চলে যাই।'

'মিটিঙে বসতে হয়ে,' বব বলল। 'সবাইকে জানানো দরকার, বিশেষ করে কিশোরকে। আলোচনা কৰলেই একটা কিছু উপায় বেরিয়ে পড়বে। চলো।'

সোজা কিশোরদের বাড়িতে চলে এল ওরা। বাগানে চুকতেই মিশার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'মিশা, খবর আছে!' ববে উঠল রবিন। 'কিশোর কই? জরুরি মিটিং ডাকা মেডেল রহস্য।'

দরকার।

'তিনটাৰ আপে তো আসবে না,' মিশা জানাপ, 'শালুৰ সাপে কোথায় জানি গেছে। একই জৰিবি! ঠিক আছে, এলে বলল। তোমাদেৱকে চেলিখোন কৰলৈ।' 'না, ফোন কৰাব দৰকার নেই। তিনটো বাজলৈ আমৰাই নহিয় চলে আসব।' মিশা, জেনারেলেৰ মেডেলগুলো কোথায়, কৰ্তৃত আমৰা।'

তমে কেটিৰ থেকে ঠিকৰে বেৰিয়ে আসবে মেন মিশার চোখ। 'বলো কি? কোথায়?'

বৰিন জবাৰ দেয়াৰ অগেই, দৰজায় বেৰিয়ে এলেন মেরিচাচি, কাজ কৰতে ভাকলেন। কাজেই শেনা আৰ হোৱা না। বলল, 'ঠিক আছে, তিনটোৰ দেৱা হৈব।'

গেটোৰ দিকে রশনা হোলো আৰাৰ মুসোৱা।

থেতে থেতে বৰিন বলল, 'তিনটোৰ কিশোৱ যিন্দলে হয়। যাকগে, চলি এখন। খুৰ টায়াৰড় লাগছে। অনেক ছোটাছুটি কৰলাম।'

'হ্যা,' মাথা ঘৰকাল অনিভা। 'এখন শুধু ডলিকে জানানো বাকি। আমি ওকে জানিয়ে দেব। তনে যা চমকে যাবে না।'

তিনটায় এসে আবাৰ কিশোৱদেৱ বাগানে চুকল ওৱা। ছাউনিৰ দিকে এগোতেই মেখল দৰজায় বসে আছে ঠিক।

সাড়া পেয়েই দৰজায় বেৰিয়ে এল কিশোৱ, সঙ্কেত-ফৰকেতেৰ ধাৰ দিয়োও গেল না আজ। 'এসো, এসো, ভলদি এসো! শোনাৰ জন্মে অস্থিৰ হয়ে আছি আমি। নিশ্চয় অনেক কিছু জেনেছি?'

'হ্যা, জেনেছি,' বৰিন জবাৰ দিল। 'কলনাই কৰতে পাৰবে না, কী জেনেছি। হায়, আমাৰ ব্যাজ ফেলে এসেছি...'

'বাদ দাও ব্যাজ!' হাত নেড়ে বলল কিশোৱ। 'জৱাৰি যিটিঙে ওসবেৱ দৰকার নেই।'

বাঞ্ছেৱ ওপৰ বসে পড়ল সবাই।

'হ্যা, যা যা হয়েছে এবাৰ বলে ফেলো,' কিশোৱ বলল। 'মিশাৰ কাছে ভনলাম, মেডেলগুলোৰ খোজ নাকি পেয়েছে?'

'হ্যা,' ধৰ জানাল। 'বদমাশ লোকটা যদি সত্যি বলে থাকে। ও বলল, রাতেৰ বেলা একজনকে নাকি দেখেছে একটা চামড়াৰ বাঞ্ছ নিয়ে গিয়ে পাৰিৰ গৰ্তে ফেলতে। গৰ্তটা এত ছোট, সক হাত ছাড়া চুকবে না। কাঠঠোকৰার গৰ্ত।'

'তাৰ মানে সক হাতওয়ালা কেউই কেবল বেৱ কৰতে পাৰবে,' কিশোৱ

ভলিউম ৫৯

অনুমান কৰল: 'যাক, এটা একটা পৰৱৰ্তী পাইল সেবিয়েছে।'

'না,' বলল ভৰিন: 'শুধু একটু বলেছে, আৰু সেবাসে বসে বেৰেছি তাৰ দেকে বেশ দূৰে না ওঠা।'

'কিষু তাতে তেৱেন সুবিধে হবে না,' মালা নাড়ুল অনিভা। 'ভজন ভজন পাঞ্জ রয়েচে আশপাশে। ওঙ্গলোৱ কোনটাটোৰ রয়েছে একটা কাঠঠোকৰার বাসা, যোটাতে মোটা হাত ঢেকে না। অনেক বাস আছে, মেখলোৱ গৰ্ত এত বড়, পৰে হাত চুকিয়ে দিলেও নিচৰা নাগাল পাৰওয়া থাব না। প্ৰকৰ কোন গৰ্তে কেলে ধাকলে বেৱ কৰাই মুশ্কিল।'

'হ্যা,' অনিভাৰ কথায় একমত হয়ে বলল বৰিন, 'ওই গৰ্ত হৌজা বড়েৰ গদায় সুচ পোজাৰ সমিল। গৰ্তটা কেৱলিনৈই পুঁজে পাৰ না আমৰা।'

'মীৰব হয়ে গেল সবাই। একে অনেকৰ দিকে তাৰাচ্ছে।'

'তা কাৰণ কেন পৰামৰ্শ আছে?' অবশেষে বলল কিশোৱ। 'সবাই মিলে ভাবনাভাৰ কৰে বি কিম সেৱ কৰতে পাৰি না আমৰা?'

মিশা বলল, 'একটা বাপাসে শিৰৰ হতে পাৰি, ওই গৰ্ত থেকে দেৰিৰ নিজে বাঝুটি বেৱ কৰে নিতে পাৰবে না। সক হাতওয়ালা কাৰও সাহায্য লাগবে। সেটা সে কৰতে যাবে না জানাজানি হয়ে যাওয়াৰ ভয়ে। তাৰচেয়ে বৰং গাছেৰ কাছাকাছি শুকিয়ে ধাবনে চেৱটাৰ অপেক্ষা। বেৱ কৰাৰ কেৱল একটা বাবহা কৰাইহৈ চোৱটা। আৱ বেৱ কৰাইহৈ গিয়ে ধৰবে দেৰি। হয় ছিনিয়ে নিতে চাইবে, নইলে হাগ চাইবে। আমাৰও গিয়ে শুকিয়ে ধাবতে পাৰি। কেৱল গাছ থেকে বেৱ কৰাৰ চেষ্টা কৰে চোৱ দেখব। তাৰপৰ সেলিয়ে দেব টিচুকে...'

'তাৰ দেখিয়ে তাড়নোৱ জন্মে! উত্তেজিত হয়ে মোনেৱ কথাটা শেষ কৰে দিল কিশোৱ। 'মিশা, খুৰ ভাগ শুকি বেৱ কৰাইহৈ!'

'পুলিশকে জানিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'না, তা বোধহয় ঠিক হবে না। পুলিশকে জানাতে গোলৈ পুৰুষারেৰ ব্যাপৰটা উটে পড়বে। আৱ একবাৰ যখন যোৱান কৰে ফেলেছে জেনারেল, মেডেলগুলো পাৰওয়া গেলে সেটা তাকে দিতেই হবে। হয়তো পুলিশই টাকাটা নিয়ে কেৱল হাস্পাতালে দান কৰে দেবে। আমৰা চাই না চোৱা জেনারেলোৱ পকেট থেকে অথবা এতগুলো টাকা খনে যাক।'

'তাৰ পুলিশকে দলে টানতে পাৰলৈ ভাল হত। ওদেৱ ক্ষমতা অনেক বেশি। সেই তুলনায় আমৰা কিছুই না।'

'টিচু যখন আমাদেৱ সঙ্গে থাকছে,' ভলি বলল, 'অত তয় পাই না!'

মেডেল রহস্য

৭৯

'ইফ!' বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল টিটু, মাটিতে বাঢ়ি মারল লেজ দিয়ে।  
'কে কে যাবে, সেটা ঠিক করে ফেলা দরকার এখন,' কিশোর বলল।  
দেখা গেল সবাই যেতে চায়।

'সেটা সঙ্গে না,' কিশোর বলল। 'এত লোক গেলে ঝুকিয়ে থাকতে পারব  
না। শব্দ করে ফেলব। তাতে চোরটার নজরে পড়ে যেতে পারি।'

এরপর অনেক আলোচনা, অবেক তর্কিভর্তি চলল। শেষে কিশোর বলল,  
'তাহলে দাঢ়াচ্ছে, আমরা আপগত কাউন্টে বলছি না। রাতে এখানে এসে দেখ  
করবে। গরম কাপড় নেবে, ঠাণ্ডা পড়তে পারে। টর্চ তে অবশ্যাই লেবে। দেখে  
নেবে ব্যাটারি তাজা কিনা। হাঁটাং নিয়ে গিয়ে অঙ্ককারে বিগদে পড়তে চাই না।'

'চাঁদ থাকবে,' মনে করিয়ে দিল ডলি। 'অতটা অঙ্ককার বোধহয় হবে না।'

'বনের ভিতর আলোও থাকবে না হেমন,' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া মেঘ  
করতে পারে, চাঁদ ঢেকে যেতে পারে। ঝুঁকি নিতে যাব বেন? তারচেয়ে ব্যাটারি  
চেক করে নেয়াই ভাল। বনের ভিতরে চুকে চুপ হয়ে যেতে হবে আয়াদের।  
নেহায়েত দরকার না পড়লে কথা বলব না। আর বলতে হলে 'ফিসফিস করে,  
বুঁুচেছ?'

'হ্যা,' ফিসফিস করে বলল সদস্যেরা, যেন এখনই বনের মধ্যে চুকে বসে  
আছে।

'সবাই আমরা ঝুকিয়ে থাকব,' কিশোর বলল। 'কেউ গাছের ডালে, কেউ  
বোপের ভিতরে। আবার বলছি কোন শব্দ করা চলবে না। বুঁুচেছ?'

'হ্যা, আবারও বলল সবাই।'

মেয়েরা বেশি উত্তেজিত। কারণ এ-রকম অভিযানে ওরা কুমই যায়, সেয়া হয়  
না ওদেরকে, এ-সব কাজ সাধারণত দলের ছেলেরাই করে।

'টিটু থাকবে আমার কাছে,' কিশোর বলল। 'চোরটা এলে কোন গাছটার  
কাছে যায় দেখব, তারপরই দেব টিটুকে ছেড়ে। লোকটাকে ভয় দেখিয়ে টিটু  
আড়িয়ে দেয়ার পর গর্জ থেকে বাঁক বের করার চেষ্টা করব আমরা।'

'দাকুগ মজা হবে!' উত্তেজনায় চোখ চকচক করছে অনিতার। 'তবে তাও  
করছে!'

'না, তাহলে তেমন কিছু নেই, যদি যেভাবে বললাম সেভাবে কাজ করতে  
পারো। যদি ভয় পেয়েই যাও কেট, চুপ থাকবে, আড়লি থেকে বেরোবে না,  
তাহলেই কোন চিন্তা নেই। আর যাই করো, বেকামি করে সব বিছু ভঙ্গল কেৱো  
না। এবন তাহলে এ-পর্যন্তই। সময়সূচি তলে আসবে। কেউ দের করলে তাকে

ফেলেই চলে যাব আমরা।'

সবাই মনে মনে ঠিক করে ফেলল, দেরি তো করবেই না, বরং নিনিটি  
সময়ের আগেই চলে আসবে। আজকের এই উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ মিস করতে  
রাজি নয় বেটে।

'ইস, যদি খালি মেডেলতলো খুঁজে বের করতে পারতাম!' একা একা বাঢ়ি  
ফেলার সময় আপনমনেই বলল রবিন। 'নিয়ে যেতে পারতাম জেনারেলের কাছে!  
কী মে খুলি হতেন তিনি! তাঁর সেই হাসিমুখ দেখতে পারলে দুনিয়ার আর কিছুই  
চাইব না আমি।'

## সাত

মুসাকে টর্চে নতুন ব্যাটারি ভরতে দেখে কৌতুহলী হয়ে উঠল বাবলি। জিভেস  
করল, 'তাতে বাইবে যাইছে নাকি? কোথায়?'

'যেখানেই যাই, তাতে তোর কি?' ধূমক দিয়ে বলল মুসা। 'দূর ই এখান  
থেকে!'

'দলের সঙ্গে কোথাও যাইছিস তুই,' একচুল সরল না বাবলি। 'বল না,  
কোথায় যাইছিস?'

'সর!'

'তাহলে সত্তিই যাইছিস কোথাও!'

'ভাগিনি মেদে হয়ে জন্মেছিস। নইলে এমন মার দিতাম এখন, দাদার নাম  
ভুলিয়ে ছাড়তাম! যা ভাগ!'

'যাইছ,' পোচা দিয়ে বলল বাবলি, 'তবে তোর পিছু না নিয়ে ছাড়ব না। আমি  
আর নিন দুজনেই যাব।'

ভয় পেয়ে গেল মুসা। গলার ক্ষেত্রে একটু নরম করে বলল, 'বললাম তো,  
তেমন কোথাও যাইছ না। মীটিং আছে আমাদের। এখন যা।'

জবাব না দিয়ে সরে এল মুসা। নিজের ঘরে চুকে দরজা বন্ধ করে দিল।  
বাবলিটাকে নিয়ে আর পাশা যায় না! এত হেঁক হেঁক করলে চলে কিভাবে!  
আকর্ষণ্য, কী করে জানি গুরু পেয়ে যায়! ওরই মত আরেক শয়তান, নিনাকে নি-

৬-মেডেল রহস্য

৮১

পিছু নেবে! নাত, কী করে যে খসাবে ও-দুটোকে লেজ হেকে...

সে-বিকলে সবাই যার যার চার্ট পরীক্ষা করে নিল। কিশোরের নির্দেশ অন্তরে অন্তরে পালন করতে হবে। টিটু বুঝতে পারছে না, কিশোর আর মিশা এত অঙ্গুর কেন। আসলেও তো জানে না, ওনের ডুজনের সময় কাটতে চাইছে না, অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে, কখন সন্ধ্যা হবে, রাত নামবে...

'টিটু, শোন,' একসময় কিশোর বলল, 'তোকে যা যা করতে বলা হবে ঠিক তা-ই করবি। একটা লোককে পাকড়াও করতে হতে পারে। শুধু আটকে রাখবি, কামড়াবি না কিন্তু, খবরদার। আর আমি বলার আগে টু শব্দটি করবি না, বুকেছিস?'

কি বুকল টিটু কে জানে, শুধু বলল, 'হ্যাঁ!

সময় যেন থেমে গেছে লধশদের সবার জন্মেই। কাটতেই চাইছে না। আজ কি আর অঙ্ককার হবে না! হলো। তবে তার আগেই ঘন মেঝে ঢাকা পড়ল আকাশ। ফলে ধীরে ধীরে নয়, রাত দেখে এল আচমকা।

বাবার সময় কিশোর আর মিশাকে অন্যমন্ত্র আর অঙ্গুর দেখে আবাক হলেন মেরিচাটি। জিঞ্জেস করলেন, 'কি রে, তোদের শরীর খারাপ নাকি?'

'না তো! কেন?' সতর্ক হয়ে গেল কিশোর। 'না শরীর খারাপ না। এমনি, একটা কথা চিন্তা করছি। একটা জরুরী মীটিংগে বসব। তুমি আর চাচা তো বাইরে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। ফিরতে দেরি হতে পারে। তোরা বেশি রাত করিস না কিন্তু। সকাল সকাল শয়ে পড়িস।'

মনে মনে হাঁপ ছাড়ল কিশোর। চাচা-চাচি বাইরে চলে গেলে ভালই হবে। রাতে ওনের বেরোনের জন্মে আর কেনেরকম কৈফিয়ত দিতে হবে না।

অঙ্ককার নামতেই নিঃশব্দে ছাউনির কাছে এসে হাজির হতে লাগল সদস্যরা। মাকে মাকে বাগানের পথে দেখা গেল তাদের আলো।

'সবাই হাজির?' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'বেশি চলো।'

দল বেঁধে রাখনা হলো ওরা। টিটু চলল কিশোরের পায়ে পায়ে। খানিক পথে হঠাত করে যেষ কেটে গেল চাঁদের ওপর থেকে, অঙ্ককার দূর হয়ে গেল অনেকখানি। তবে উজ্জ্বল হতে পারছে না জ্যোৎস্না। বনের ভিতরে অঙ্ককার বেলি, পোড়ার অলো তেমন চুক্তে পারছে না যেখানে ঘন গাছপালা রয়েছে। গাছের পোড়ার অমাট ছায়।

'এই, কিশোর শব্দ?' ঘমকে দাঁড়াল কিশোর। 'মাট করে উঠল না! মরা ভালে

পা দিয়েছে কেউ।'

মুসাও ধমকে গেল। বাবলি-মিনা নয় তো! কিন্তু ওকে তো বেরোতে দেখাব কথা নয় বাবলির। আর কোন শব্দ শোনা গেল না। আবার চলতে লাগল দলটা।

অনিতার হাত ধরল ভলি। ভয় সে পায়নি, তবে অস্তত একজন বন্ধু যে তার খুব কাছাকাছি রয়েছে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে চাইছে।

চলতে চলতে একবার এখানে ঝকচে, একবার ওখানে ঝকচে টিটু। রাতের বেলা দলের সঙ্গে দেরিয়ে বেশ ভাল লাগছে তার।

হেনরির সঙ্গে যে জায়গাটোয়া বলে খেয়েছিল মুসারা, সেই জায়গাটোয়া চলে এল।

'আশেপাশেই কোথাও রয়েছে গাছটা,' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'ইশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। লুকিয়ে পড়া দরকার। যার মেখানে শুশি শুকাও, তবে চুপচাপ থাকবে। ছাড়িয়ে পড়ো। তাহলে অনেক দূর পর্যন্ত নজর রাখতে পারব আমরা।'

অদৃশ্য হয়ে গেল লধশরা। এমনকি টিটুও গায়ের। গাছে উঠে পড়ল কিশোর আর মুসা। মিশা খুঁজে গেল ঘন একটা ছেপ। ভিতরে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে নজর রাখা যায়। বড় বড় পাতায়ালা একটা লতা-কাঁচের ভিতরে উপুড় হয়ে গেয়ে পড়ল ভলি। আশা করল, কেউ তাকে মার্ডিয়ে যাবে না। গেলে কী হবে সেক্ষে আর আবাতে চালিল না সে। অনিতাও চুকল একটা ঝোপের ভিতর। 'ইচে কলে এখানে ঘুমোতেও পারি,' ভাবল সে। তবে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে, ঘুমের লেশমাত্র নেই চোখে।

পুরানো একটা ওক গাছের মত ভালে চড়ে বসল রবিন আর বব। চিত হয়ে যাবা যায়, এত মোটা ভাল। তা-ই বরল ওরা। ফিসফাস করে আলাপ ছাড়ে দিল দুজনে। কিশোর যে গাছটায় চড়েছে, তার পোড়ায় লতাপাতার ভিতরে লুকিয়ে বসে রাইল টিটু। কান খাড়া। মনিবের মির্দিশের অপেক্ষায় রয়েছে।

কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ভাল, কিশোর ভাল। খুব ভাল। তারমানে চোরটার নজরে পড়বে না ওরা কেউ।

কাছেই একটা গাছে পেঁচার কর্কশ চিংকার চমকে দিল সবাইকে। সাথে সাথে গরগল করে উঠল টিটু, মুদু ধমক দিয়ে তাকে থামাল কিশোর। চুপ হয়ে গেল টিটু। তবে কান খাড়া রেখেছে। ওভাবে হঠাত ডেকে উঠল কেন পাখিটা, বুঝতে পারছে না সে।

গর্ত থেকে দেরিয়ে অলস ভঙিতে যাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল একটা মেডেল রহস্য।

খরগোশ। আরেকটা বেরিয়ে এসে যোগ দিল গুটার সঙ্গে। নাচনাটি করে খেলতে শুরু করল। গাছের ফাঁক দিয়ে এসে পড়া ঠাঁদের আলো পড়েছে ওগোরের গায়ে। অত কাছে দুটো খরগোশ নেচে বেড়াচ্ছে! অথচ কিছুই করতে পারছে না সে!

গাছের মগভাল থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে এল একটা কাঁটিভূলী। রবিন আর বককে দেখে থেমে গেল। সতর্ক হয়ে উঠেছে। কেউ নতুন না ওরা, পড়ে রাইল মরার মত। অবশেষে কাঁটিভূলীটা ভাবল, 'ওরা বিপদ' নয়, গাছেই অংশ। লাফ দিয়ে এসে উঠল রবিনের পিঠে। সরে এল তার মুখের কাছে। নাকের কাছে নাক এনে উক্তে লাগল।

'এহচে, ওরকম করিসনে! সুড়মুড়ি লাগে,' বলল রবিন।

আর কী দাঢ়ায় গুটা। তিনি লাফে পাতার আড়ালে উধাও।

প্রচণ্ড হাঁচি পেল মুসার। নাকের ভিতরে সুড়মুড়ি। চাপা দেয়ার জন্মে যেক শিল্পতে লাগল। কিষ্ট ঠিকাতে পারল না। বাঢ়তে বাঢ়তে একবারে লিফেরণশি ঘটিয়ে ছাড়ল মেন হাঁচিটা। এত জোনে 'হাঁচে' অনে ভয় পেয়ে গেল। বাদ দিয়ে লাফাতে লাফাতে গিয়ে আবার গর্তে চুকল খরগোশ দুটো। ওদেরই বা দোষ কি। শব্দের কারণে চমকে গিয়ে আরেকটু হলে কিপোরই পড়ে যাচ্ছিল গাছ থেকে। 'এই কী করো! হিসিয়ে উঠল সে। 'আর মেন না হয়! চাপতে পারো না!'

'অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি,' লাজিত কঠে বলল মুসা। 'আমিও তো পড়ে যাচ্ছিলাম...কিশোর, খুব সুন্দর চীন উঠেছে আজ...'.

'চুপ!' ওদের দেখাদেখি সবাই আলাপ শুরু করে দিতে পারে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি মুসাকে ধামিয়ে দিল কিশোর।

শুরু সীরবতা বিরাজ করল কিছুক্ষণ। ভাবপর বইতে আরম্ভ করল বাতাস। সড়সড় করে উঠল গাছের পাতা। বেগেপেগে ফাঁকফোক দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় বিচির শব্দ তুলল। ডলির মাথার কাছে এসে নিছ একটা তালে বসে আবার তেকে উঠল পেঁচাটা। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে একলাকে দৌড়িয়ে গেল ডলি।

'দূর, বোকাগুলোকে দিয়ে কিছু হবে না!' রাগে বিপৰিত করল কিশোর। ভেকে বলল, 'এই ডলি, বাড়ি চলে যাও। যাও!'

দুর্ঘে কেতে চোবে পানি এসে গেল ডলির। তার কী দোষ? হচ্ছাড়া জনোই তো এ-রকম ঘটল! মরুক শয়তান পাখিটা! চলচাপ আবার আগের মত শয়ে পড়ল সে।

আবার সীরবতা। পেঁচাটা চলে গেছে। হাঁচি অনে ভয় পেয়েছে, আর হত্তম

পেঁচার ডাক আতঙ্কিত করে দিয়েছে খরগোশকে, আর বেরোল না একটাও। আর কেউ হাঁচি দিল না। কাশলও না, তবে জোরে হাই তুলল কে যেন, আওয়াজ শোনা গেল।

'হ্ৰশ!' সাবধান করল কিশোর। 'কেউ আসছে!'

যে যেখানে রয়েছে, নিথর হয়ে গেল লব্ধপুরা। উত্তেজনায় বুকের ভিতরে দুর্দুর করছে ওদের। ডলির মনে হচ্ছে, বোধহয় ওর বুকের খাচা ভেঙেই বেরিয়ে চলে আসবে ঝুঁপিঙ্গটা, এত ধড়াস ধড়াস করছে।

হ্যাঁ। সত্তি কেউ আসছে। টিচু তো বাটেই, হেলেমেয়েরাও অনতে পাছে মৃদু পায়ের শব্দ। পায়ের নিচে পড়ে মঠ মঠ করে ভাঙল ভকনো ভাঙল। বার দুই গলা পরিষ্কার করল আগস্তুক। কে? চোরটা? না হেনরি ডেরিক? নাকি অন্য কেউ, চাননী রাতে বনের ভিতরে হাঁচেতে এসেছে?

হেনরি দেরিক! ওই তো, জানের আলোয় চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। মেডেল খুঁজতে এল নাকি? মনে হয় না। কানগ গৰ্জির ভিতরে চুকবে না তার বিশাল থাবা। চোরটার জন্যে অপেক্ষা করবে। মেডেলগুলো ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।

নৱম গলায় শিশ দিতে দিতে এগোল হেনরি। এত কাছ দিয়ে গেল যে ডলির ভয় হলো তাকে না মাড়িয়েই দেয়। কিছুতুর এগিয়েই থেমে গেল লোকটা। না, লধশপের খুঁজে না নিষ্যাই। তার জানার কথা নয় যে ওরা এখানে লুকিয়ে রয়েছে।

'চোরটাকে ধরতেই এসেছে সে,' কিশোর ভাবল। আস্তে করে গলা বাড়িয়ে উঠি দিল ডলির নিচে। 'কোথাও লুকিয়ে থেকে নজর রাখতে গাছটার ওপর, যে পাছে গর্তে রয়েছে বাঁকটা। ওরাও খালিক পরেই জানতে পারবে, কোন গাছের গর্তে ওটা লুকিয়েছে চোর। এখন টিচু বা অন্য কেউ কিছু না করে বসলেই হয়।'

মোটা একটা ওক গাছের কাছে গিয়ে তার আড়ালে লুকাল হেনরি। কলমাই করল না, মাথার ওপরই রয়েছে বব আর রবিন।

নিঃশ্বাস ফেলতে ভয় পাছে দুজনে, হেনরি যদি তানে ফেলে? একটু দূরেই মেডেল রহস্য

## আট

মাটিতে পেট ঢেকিয়ে হমড়ি খেয়ে পড়ে আছে টুঁ। সবাই নীরব। টুঁ শব্দ করছে না। উত্তেজিত হয়ে অগ্রস্ত করছে। কী ঘটে! কী ঘটে!

ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। টিটু নয়। অন্য কুকুর। বোধহয় চোরটা নিয়ে আসছে। হয়তো টের পেয়েছে কোনভাবে, হেনরি ভেরিক অপেক্ষা করছে তার জন্য।

অবার মৃদু শিস শোনা গেল। জ্যোত্ত্বায় আলোকিত ঘানে ঢাকা এক চিলতে জমিতে বেরিয়ে এল কেউ, পিছনে একটা বিশাল কুকুর। ভলিব কাছ থেকে মেঁদ দূরে নয় ওরা।

'সর্বনাশ, আলসেশিয়ান!' কিশোর ভাল। 'টিটুর গুরু না, পেলেই হয় এখন।'

হাঁও হো হো করে উঠল কুকুরটা। তাহলে কি টিটুর গুরু পেয়েই গেল? নাকি লধশদের কারণেও?

'এই ভোবার, চুপ!' ধূমক লাগাল লোকটা। 'এখানে কেউ নেই। নিয়ন্ত্রণে গুরু পেয়েছিস।'

জান্তিকু পেরিয়ে করেকটা বড় গাছের জটলার দিকে এগাল লোকটা। ভোবার চলল তার পিছনে। কিন্তু ঘৃণ্যত বুর হলো না। দেখ গেল, চুপিবাড়ি আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে হেনরি। দাঁড়িয়ে গেল ভোবার। সেদিকে ফিরে ঘৃণ্যত করে উঠল জোনে জোরে।

চেঁচিয়ে বলল হেনরি, 'নিক, আমি। মেডেলগুলো বের করো, তারপর বল আছে। একটা পুরুষের ঘোষণা করা হয়েছে। সেটা ভাগাভাগি করে নিতে পারি আমরা।'

'না, আমি সেটা করছি না,' হেনে উঠল নিক। 'ভূমি যে আসবে এটা আগেই সন্দেহ করেছি, সে-জন্মেই ভোবারকে নিয়ে এসেছি। ভেড়িবেড়ি করলেই সেই লেলিয়ে। যাও, ভাগো।'

'ভোবার আমাকে চেনে, কিছু করবে না। বের করো ওগুলো।'

'পারলে নিজেই এসে বের করে নাও। নিক আমিনি। বাস্তু বের করার ইচ্ছে নেই আজ। এসেছি শুধু দেখতে ভূমি আসো কিনা। তা এত ভাবনা কিসের? আছে তো এখানেই, এই গাছটার গর্তে। দেখ এসে, তোমার ভালুকের মত থাবা ঢেকে কিনা।'

'চোকে যে না সেটা ভাল করেই জানো,' রেগে গেল হেনরি। 'আমার সংস্কৰণ বেঙ্গলনী! আমাকে ফাঁকি দেবে। সেটি হচ্ছে না। এখন ভাল চাও তো, নিক নিয়ে এসো গে। বের করো ওগুলো নাও আমার হাতে। নইলে...'

ভলিউম ৫

হেনরিকে বাস করে হেনে উঠল নিক।

বাগে জলে উঠল হেনরি। চোখের পলকে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল নিকের ওপর। ঘুসি মেরে তোকে ফেলে দিল মাটিতে।

তবে সে-ও খাড়া থাকতে পারল না। উড়ে এসে তার ওপর পড়ল, বাদের মত কুকুরটা। হেনরিকে নিয়ে পড়ল মাটিতে।

লধশ এ সবাই দেখতে পাচ্ছে। ভয়ে, উত্তেজনায় কাঁপছে ওদের বুক। মজা পাচ্ছে শুধু টুঁ। অনেক কষ্টে সামলে রেখেছে নিজেকে। তারও প্রচও ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে বিশাল কুকুরটাকে সাহায্য করে।

বেশিক্ষণ চপ থাকতে পারল না টুঁ। চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে।

ঘট করে নাথা ভুল আলসেশিয়ান। মুখ ফেরাল এলিকে। এই সুযোগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হেনরি।

চেঁচিয়ে আদেশ দিল নিক, 'ভোবার, ভলদি ধরো ওই কুকুটাকে।'

ছুটে এল আলসেশিয়ান। টিটু ভাল, তার সঙ্গে খেলা করতে আসছে। আড়াল থেকে বেরিয়ে নামতে শুরু করল কিশোর। মুসাও নামছে। দুজনেই প্রচও ভয় পেয়েছে। কামড়ে ফালা ফালা করে দেবে টিটুকে! চিংকার করে উঠল কিশোর, 'টুঁ সর! সর, টুঁ, সর!'

গাছ থেকে হাঁও দুটো ছেলেকে সামনে পড়তে দেখে অবাক হয়ে গেল আলসেশিয়ান। হেনরি আর নিক যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। ধ্রুবে একটা কুকুর, তারপর দুটো ছেলে... হতচাহাড়া এই বনভূমিতে ঘটছে কী মজা।'

টুঁ তখনও বিপদ বুঝতে পারেনি। ঝুশিমনে আলসেশিয়ানটাকে ঘিরে নাচতে আবস্থ করল। সোক দুটো এসে দাঁড়াল মুসা ও কিশোরের কাছে। কিশোরের কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকুনি নিয়ে বলল হেনরি, 'এই ছেলে, এখানে কী করছ? শুচ্ছচরগিরি, না? কুকুরটাকে নিয়ে যখন কামড় খাওয়াব, তখন বুঝবে আজ রাতে!'

'ছাড়ুন!' রেগে গেল কিশোর। 'হ্যা, শুচ্ছচরগিরিই করতে এসেছি, তাতে কুকুনো আছে জানেন। সেটাই দেখতে এসেছি, কোথাকে কিভাবে খুঁজে বের করে আপনার দোষ। এখন বুঝতে পারছি, সিকের, মাথায় আঁটা লাগিয়ে সেরাতে জেনারেলের ঘরের জানালার ছিটকানি খুলেছিল সে।'

মেডেল বহস

'এখনি আমায় যাইতে আমরা,' হমকি দিল মুসা। 'শুলিশ এসে আপনাদের দুজনকেই ধরবে।'

পরোয়াই করল না হেনরি। কিশোরের হাতটা টেনে নিয়ে চোখের সামনে এনে দেখল, তারপর বলল, 'এসো! গর্ত থেকে বাক্সটা বের করবে। হাত ছেষ্টি আছে, সিক-চিকের দরবকার হবে না, গর্ত চুকবে মনে হচ্ছে। এসো।'

কিশোরক গাছের দিকে টেনে নিয়ে চলল সে। টিটু রেণে গেল আর রেণে গেলে সাধারণত যা করে তা-ই করে বসল। লাফ দিয়ে গিয়ে কামড় বসানোর চোঁ করল হেনরির পায়ে। লাখি মেরে তাকে সরিয়ে দিল হেনরি। ব্যথা পেয়ে কেউ কেউ করে উঠল টিটু।

টিটুয়ে উঠল কিশোর, 'ওকে মারছেন কেন। ও কী আপনার সমান। বাজা তো, তাই পারলেন... ওর বাপের গায়ে খালি হাত ছুইয়ে দেখতেন, দুটি কামড় ছিঁড়ে ফেলত।'

কিশোরের কথা কানেই নিল না লোকটা। আবার লাখি মারতে দেল টিটুকে। আর সহ্য হলো না মিশার। কাছের একটা মোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে এল। টিটু, টিটু, সবে আয়। শব্দতন লোকটার কাছে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়!

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আরেকবার অবাক হওয়ার পালা হেনরি আর নিকের।

'আরেকটা বেরোল!' বিড়বিড় করল হেনরি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ধূক দিয়ে বলল, 'এই, আর ক'জন আছে?'

আর চুকিয়ে থাকার কোন মানে নেই। দুই চোরকে আরও তাজ্জব করে দিয়ে সবাই একে একে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে।

'কাও দেখো! নিক বলল। 'করছে কী এখনে...'

'আজ সকালে এগুলোর সাথেই দেখা হয়েছিল আমার,' তত্ত্বায় উঠল হেনরি। 'কি জানি একটা বিদ্যুটে নামওয়ালা ঝুঁক করেছে। নিক, এখনও সময় আছে। বাক্সটা বের করে আনো। নিয়ে চলে যাই।'

'না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

'বেশ, তাহলে এই ছেলেটাকে দিয়েই বের করাচ্ছ।' হেনরি বলল। হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে কিশোরকে নিয়ে চলল অনেক পুরানো বড় একটা গাছের দিকে। গোড়া থেকে কিছুটা উপরে একটা গর্ত। গর্তের মুখে টেরের চোঁ করল আলো ফেলে তার ভিতরে কিশোরের হাতটা জোর করে চুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে।

৮৮

ভালভাবে ৫৯

'উৎ, ছাড়ুন, ছাড়ুন!' আর্তনাদ করে উঠলো কিশোর। 'চুকবে না, আমার হাত চুকবে না! চামড়া লিলে যাচ্ছে... উৎ!'

কিশোরকে ছেড়ে দিয়ে আচমকা পাশে এসে দাঢ়ানো উলিয়ে হাত চেপে ধরল হেনরি। পৌরীক করে দেখে সম্ভুষ্ট হয়ে বলল, 'ঝঁা, এটাৰ হাত চুকবে। খুব সকু আৱ ছোট।'

'আচৰ্ছা! মেরে মেলাবেন নাকি?' কড়া গলায় বলল কিশোর। 'দেখছেন না কী রকম ভয় পাচ্ছে? ছেড়ে দিন! জোৱ করে তোকাতে পারবেন?'

ছাড়ল না হেনরি জোৱ করে উলিয়ে হাতটা নিয়ে গেল গর্তের মুখে।

'ওভান জোয়াজুরি করলে লাভ হবে না,' কঁপা গলায় বলল উলি। 'আপনি সৱন, দেখি আমি নিজে চোঁটা করে।'

এক মুহূর্ত ভাবল হেনরি। 'বেশ, সবচি দেখো চোঁটা করে। সাবধান, কোন চলাকি চলবে না।'

'আমি ওকে সাহায্য কৰবো,' বলে উলির পাশে এসে দাঢ়াল কিশোর। চট করে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল, হেনরি কতটা সরেছে। উলির কানের কাছে মুখ এড়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বের করেই আমার হাতে দিয়ে দেবে...'

'এই, কী বলছি!' পিছন থেকে ধূমক লাগল হেনরি।

চুপ হয়ে গেল কিশোর। যা বলার বলে ফেলেছে।

গর্তে হাত চুকিয়ে দিল উলি। আঙুলের মাখায় লাগল বাক্সটা। দুজাহলে চেপে ধরে আবে বের করে আনতে আনতে বলল, 'এই, টর্চ নেভান! চোখে লাগছে তো! কানা করে দেবেন নাকি?'

টর্চ নিয়ে দিল হেনরি। দুজনের অনেক পিছনে রয়েছে।

বাক্সটা বের করে দেবিরির অলকে কিশোরের হাতে তুলে দিল উলি। দ্রুত বারের ডালা খুলে ভিতরের জিনিসগুলো পকেটে ভরে ফেলল কিশোর। আবার সব কিছুই চোখে পড়ল না হেনরির। জোৱ কোৱে উলি কিশোরকে বলল কিশোর, কি ইয়া, বের করতে পারছ না?... আরেকটু ভিতরে ঢোকাও হাত। ... হাতে লেগেছে? পারে... বের করেছ? তত।'

দুই লাকে ওদের পাশে চলে এল হেনরি আর নিক। থাবা দিয়ে উলির হাত থেকে বাক্সটা কেড়ে নিল হেনরি। তাকে ভাগ না দিলে কী কি করবে ওসব। শেষে একটা রঘা হলো দুজনের মধ্যে।

মেডেল রহস্য

৮৯

খেদন, বাজ্জটা! মন না খোলে ওরা!—মনে মনে বলল কিশোর।

‘বুল না হেনরি! পকেটে তরে ফেলল। যাওয়ার জন্যে ঘূরতেই তার হাত  
চেপে ধরল নিক, দাঢ়াও! ছেলেমেয়েগুলোকে কী করব? ছেড়ে দিলে পুলিশকে  
গিয়ে সব বলে দেবে।’

‘ভাল কথা মনে করছ! কিন্তু কী করি? দাঢ়িও তো নেই, বাধতে পারব  
না।’

‘ডোবারকে পাহারায় যেখে যেতে পারি। কেউ পালানোর চেষ্টা করলেই  
কামড়ে দেবে। তকে বলে যাব যাতে সকাল পর্যন্ত আটকে রাখে। ততক্ষণে  
অনেক দূর চালে যেতে পারব আমরা।’

‘ঠিক আছে। বলো তাহলে।’

‘ডোবার, থাক এখানে,’ আদেশ দিল নিক। ‘সারারাত পাহারা দিবি, বুরুলি,  
সারারাত।’

‘দেখুন, কাজটা ভাল করছেন না,’ ঝীকাল কঠে বলল কিশোর।  
কিন্তু পাতাই দিল না নিক। ফ্যাকফ্যাক করে হাসল। ডোবারকে  
ছেলেমেয়েদের পাহারায় যেখে রওনা হয়ে গেল দৃঢ়জনে।

একটা গাছের গোড়ায় বসেছে লধশরা। চারপাশে একপাক ঘূরে এসে ওদের  
সামনে অলস ভঙিতে ধরে পড়ল ডোবার। তবে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। কেউ পালাতে  
চাইলেই লাক দিয়ে পিণে পড়বে তার ঘাড়ে।

‘মরলাম!’ রবিন বলল। ‘বাড়ি ফিরতে দেরি হলে অস্তির হয়ে যাবে মা,  
বাবাকে বলবে। ঘুব চিন্তা করবে। বাবা-মাকে সারারাত ভাবনায় যেখে এখানে  
বসে থাকতে পারব না আমি।’

উঠে দাঢ়াল সে। কিন্তু যাওয়ার জন্যে পা বাঢ়াতেই একলাকে কাছে চলে  
এল ডোবার। রবিনের কোটের হাতা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে এল আবার আগের  
জায়গায়।

‘লাভ নেই, রবিন,’ শাস্ত্রকষ্টে বলল কিশোর। ‘ওকে এ-সব কাজ করার জন্যে  
ক্লেইনিং দেয়া হয়েছে। প্রথমে ধরে নিয়ে আসবে। বেশি বাড়াবাড়ি যদি করি,  
কামড়ে দেবে।’

‘থাকলামই নাহর কিছুক্ষণ আটকে,’ হেসে বলল ডলি। ‘মেডেলগুলো পেঁকে  
গেছি। কিশোরের পকেটে আছে। আমি বাকি নিয়ে গেছে শোকগুলো।’

‘কি বলছ?’ কিছুই বুঝতে পারল না মিশা।

পকেট থেকে একটা মেডেল বের করে দুলিয়ে দুলিয়ে দেখাল কিশোর।

ঠামের আলোয় চকচক করে উঠল ধাতব গোল জিনিসটা। সোনার, বুকতে  
অস্ত্রবিধে হলো না। বুকল ওরা, এ-কারণেই চুরি হয়েছে জিনিসগুলো। হাসতে  
হাসতে সব কথা ঘুলে বলল কিশোর।

তখন অন্যোরাও হাসতে লাগল। তোর দুটোকে মশ ঝাঁকি দেয়া গেছে। মন  
অনেকটা হালকা হলো ওদের। তবে সারারাত বনে যাবে বনে থাকা যে সহজ  
বাধাপান নয়, বুকতে পারল খানিক পরেই। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে ঠান। পাছের  
গোড়ায় এখন ঘন কালো হায়া। বাতাস ঠাঙ্গা হয়ে আসছে দ্রুত। শীত করছে  
ওদের। তোর রাতে বেশি কষ্ট পাবে। ঠাণ্ডায়।

‘কিন্তু কিছু করার নেই।’ ডোবারকে ঝাঁকি দিয়ে সরা যাবে না এখান থেকে।

## নতু

পালানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না বুঝতে পেরে যতটা সন্তুষ্ট আরাম করে বসল  
ওরা। কিশোর আর মিশার মাঝখানে অয়ে পড়ল টুটু। তার গায়ের উত্তাপ লাগছে  
ওদের গায়ে, এই ঠাণ্ডার মধ্যে অনেকখানি শক্তি। সাপের মত বুকে হেঁটে নিছশব্দে  
আসছে যেন রাতের হিমশীতল বাতাস, হাড় পর্যন্ত কঁপিয়ে দেয়ার পোয়াতার  
করছে।

‘ইস, সাংঘাতিক শীত লাগছে,’ পেটের ওপর হাত চেপে রেখেছে ডলি।  
‘একটা কবল যদি পেতাম...’

‘গা ছেঁরার্হে করে এসো সবাই,’ পরামর্শ দিল রবিন। ‘শীত কিছুটা কম  
লাগবে। মেঝেরা, ডেবার মাঝখানে বসো। আমরা দুপাশে থাকছি।’

দ্রুত সঙে বসল ওরা। টুটুর মাথা কোটের ওপর রেখে তাকে জড়িয়ে ধরে  
রাখল কিশোর, অনেক আরাম লাগল তাতে। ‘দাঢ়াও, পালা করে সবার কাছেই  
একবার করে পাঠাও,’ বলল সে। ‘সবাইকেই গরম বিতরণ করলেই।’

ওরা যে এত সব করছে মেখেও যেন দেখল না অ্যালসেশিয়ানটা। ওদের  
দিকে পিছন করে রয়েছে, যেন তার মনিব নিকের ফেরার পথ চেয়ে। তবে  
ছেলেমেয়েরা সন্দেহজনক কিছু করলেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি হয়ে যাচ্ছে তার কান,  
হেমন বুকলে কিন্তু দেখছে কী করছে ‘আসামীরা’। গুরগুর করে ধূমকণ  
দিচ্ছে। আরও আরাম করে বসার জন্যে উঠে দাঢ়াল কিশোর, সামান্য সরল  
মেডেল রহস্য

‘কাপাশে, ইচ্ছে করেই একটু বেশি সরল। বাস, সাথে সাথে এদিকে ঘূরে গেল প্রাণীর মাথা, চাপা ঘড়িয়াজনি বেরিয়ে এল গলার গভীর থেকে। তবু কিশোর বসছে না দেখে দাঁত দের করে ভেঙ্গি কাটল। বসে পড়তে বাধ্য হলো কিশোর।

‘আরে, ন্যাটা,’ ধমক দিয়ে বলল রবিন, ‘একটু ঘুমোতেও পারিস না? ঘুম না এলে চোখ করে পড়ে থাক মরার মত!'

কিষ্ট কোন কথাই শনল না ডোবার। যেমন ছিল তেমনি রইল। মুহূর্তের কিছু একটা গওগোল হয়েছে। তবে এ-বাপারে তার কিছু করারও নেই। আবার। নাক তুলে বাতাস ঝুঁকল। গর্ত থেকে বেরোনো খরগোশের গুঁপ পেয়েছে।

ফৌস করে নিশ্চাস ফেলল কিশোর। বলল, ‘ইস, কখন যে সকাল হবে! বছ দেরি এখনও। অ্যালসেশিয়ান্টা আমাদের ছাড়তে ছাড়তে অনেক দূরে চলে যাবে চোরগুলো।’

‘তবে,’ ডলি বলল, ‘যখন বাজ্টা খুলে দেখবে খালি, পেঁচার মত করে ফেলবে মুখ। ওদের মুখটা যদি তখন দেখতে পারাতাম।’

‘বেশি তাড়াতাড়ি দেখলে মুশকিল হবে,’ মিশা বলল। ‘ফিরে আসবে আবার। আমাদের কাছে আছে কিনা দেখাব জন্যে।’

‘তাই তো!’ অশ্বত্তি ফুটল কিশোরের কঠে। ‘এ কথাটা তো ভাবিনি। তিউ, কান খাড়া রাখ। ওদের সাড়া পেলেই বলবি।’

‘হ্যাঁ!’ বলেই উঠে বসল টিটু। কাজ পেয়ে গেছে। আর আলসেমি করার মানে হয় না।

আধঘণ্টা পেরোল। মনে হলো যেন অর্ধেকটা বছর পেরিয়েছে। ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে ডলি। সে এত কাঁপছে, সবাই রসিকতা করল, তার গায়ের কাঁপনি ছাড়িয়ে পড়ছে ওদের গায়েও।

‘ভাগ্যস গরম কাপড় এনেছিলাম,’ অনিতা বলল। ‘নইলে আজ জমেই যেতাম।’

‘জমার আর বাকিটা আছে কী?’ গলার কাঁফটা খুলে নিয়ে পায়ে পেঁচাতে লাগল মিশা। ‘গায়ে আর সাড় দেই।’

হঠাৎ উঠে বসল ডোবার। পুরোপুরি খাড়া হয়ে গেল তার কান। সতর্ক হয়ে

ডলিউম ৫৯

উঠেছে টিটুও।

‘নিশ্চয় কিছু দেখেছে,’ কুকুরগুলোর পরিবর্তন দেখে রবিন বলল।

গরগর করে উঠল ডোবার। তবে টিটু শাঙ্ক রইল, যদিও শব্দটা তানেতে।

রবিন বলল, ‘সাইকেলের ঘণ্টা তুলাম মনে হলো? অবাক কাণও! এই রাতের বেলা সাইকেল নিয়ে কে আসছে এখানে?’

আবার গরগর করে উঠে ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে তাকাল ডোবার। যেন ইশ্বার করল, খবরদার, কোন চাপাকি নয়। একদম চুপ!

টিটুও কোন কোন করে উঠল। ব্যাপারটা কি? গরগর করার বদলে এ-বক্তব্য করছে কেন?

আবার শোন গেল সাইকেলের ঘণ্টা। আনন্দে হংস্যোড় করে উঠল লদশরা।

‘এটি, চোও, আরও জোরে চোও,’ কিশোর বলল। ‘লোকটার কানে গেলে নিশ্চয় দেখতে আসবে।’

‘বিষ্ট তারে লাভটা কী হবে?’ ডলি পশু তুলল। ‘অ্যালসেশিয়ানের খফর থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। উচ্চে নিজেই আটকা পড়বে। ওকে কী আর হেঢ়ে দেবে কুঠাটা?’

‘মনে হয় না,’ শীকার করল কিশোর। ‘বরং কামড়ে দিতে পাবে। যা হ্যারামী কুঠাটা।’

আবার নিরাশ হয়ে গেল সবাই। তবে কান পেতে রেখেছে, সাইকেল চালক কোনদিকে যায় শোনার জন্যে। আবার শোন গেল ঘণ্টা। এবার দুটো। তারমানে লোক একজন নয়, একাধিক। বেশি লোক হলে ঠিকাতে পারবে না কুকুরটা।

আরেকটু পর শোনা গেল কঠস্তর। ব্যক্ত নয়, ছোট মানুষের। আরও অবাক হলো লদশরা। রাতের বেলা এই হিমের মধ্যে সাইকেল নিয়ে প্র্যায়মি উভদের মত জাহাজ কারা এল।

হঠাৎ চিংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। ‘বাবলির গলা! নিশ্চয় নিমাও রয়েছে সঙ্গে।’

‘এখানে কেন এসেছে?’ কিশোরও অবাক।

‘বাবলি সন্দেহ করেছে, আজ রাতে মজার কিছু করতে বেরিয়েছি আমা...আরে এই কুঠা, অমন কয়াছিস কেন?’ ডোবারের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। ‘ঠিক আছে বাবা, বসছি, এই বসলাম, আর দাঁত বিচানোর দরকার নেই। হ্যা, যা বলছিলাম,’ কিশোরকে বলল সে, ‘মীটিঙের আলোচনার বিষয় নিয়ে

মেডেল রহস্য

৯৩

বোবেছিলাম নোটবুকে। আজ রাতে ব্রামলি উডসে যে আসছি, তা-ও লিখেছি। নিচয় নোটবুকটা খুঁজে বের করে দেখে ফেলেছে। ওই শয়তানটার জ্বালায় কোন জিনিস খুকিয়ে রাখতে পারি না...'

'পেয়েছে, ভালই হয়েছে,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'অত্যন্ত এই একটিবার ওদের আসতে তবে খুশই লাগছে। আসতে দাও। বাবলির নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকে।'

গলা ফাটিয়ে চিন্কার করে উঠল মুসা। বনের গাছে গাছে প্রতিষ্ঠিত হলো: বাবলি-ই-ই-ই-ই!

এই হঠাৎ চেঁচামেচিতে আবাক হলো ডোবার। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দ্বিধায় পড়ে গেছে যেন, কী করতে বুঝতে পারছে না। এমন কিছু করছে না ওর বন্দিরা, যাতে বাবস্তা নেয়ার দরকার হয়। শুনুই চেঁচাচ্ছে। জ্বালা যেতে উঠেছে না, পলানোর চেঁচা করছে না... তবু জোর গলায় ওদেরকে একটা ধমক লাগিয়ে, আবার সামনের দিকে পা বিছিয়ে তার গলায় থুতনি রেখে অয়ে পড়ল সে।

বাবলি আর নিনাই। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এখন ওদের গলা।

আরেকবার ডাকল মুসা।

সাড়া দিল বাবলি, 'আসছি! কোথায় তোরা?'

'এই যে, এখানে!'

'এগিয়ে আয়! আসতে না প্রারলে টর্চ জ্বলে সজ্জেত দেখা।'

বাবলি, একটা অ্যালসেশিয়ান আমাদের পাহারা দিচ্ছে। সাবধান! বেশি কাছে আসবি না।

গাছপালার ফাঁকে দূটো সাইকেলের আলো দেখা গেল, যেন কোন অজানা দানবের চোখ। গোল, উজ্জ্বল। আবার উঠে দাঢ়াল ডোবার। অলোঙ্গলোর দিকে চেয়ে গরগর শুরু করল। ঘাড়ের গোম খাড়া হয়ে গেছে। বাবলি আর নিনার জন্মে শক্তিত হলো মুসা।

'এই, বেশি কাছে আসবি না!' চেঁচিয়ে হিঁশিয়ার করল সে। 'কুতুটা ভীষণ পাজি! শনতে পাঞ্জিস আমার কথা? নেমে পড় সাইকেল থাকে।'

নেমে পড়ল বাবলি। তার হাতে একটা টর্চ জ্বলে উঠল। আলো এসে পড়ল বলিদের গায়ে। 'বা-বা, কী মজা!' টিচকারি দিয়ে বলল বাবলি। 'লবশ মিয়াদের অবস্থা দেখছি কাহিল। তা শীত লাগছে কেমন? জ্বে বরফ হয়েছে?'

অবস্থা দেখছি কাহিল। তা শীত লাগছে কেমন? জ্বে বরফ হয়েছে? আর সহ্য করল না নিনাও নেমেছে। দুজনেই সাইকেল নিয়ে চেলে এগোল। আর সহ্য করল না

ভলিউম ৫৯

ডোবার। গর্জে উঠে দাত বিচিয়ে ছুটে গেল ওদের দিকে।

আতঙ্কে চিঙ্কার করে উঠল নিনা। দিশেহারা হয়ে পড়ল।

'চুপ!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'একদম চুপ করে থাকো। একটুও নড়ে না। দোড় দিলে মরবে।'

ছির হয়ে দাঢ়িয়ে থেকে বাবলি জিজেস করল, 'কুতুটা তোমাদের আটকে রেখেছে কেন?'

'সেকথা এখন তোকে বলা যাবে না,' গল্পীর হয়ে বলল মুসা। 'তবে ইচ্ছে করলে আমাদের সাহায্য করতে পারিস। পুলিশকে নিয়ে আমাদের থবর জানতে পারিস। যা দেখে পেলি বলবি ওদেরকে নিয়ে। তোদের শয়তানীটা এবার আমাদের উপকারেই লাগল মনে হচ্ছে।'

'কথা হিরি দেখো না...,' নিজের অজ্ঞানেই সাইকেল চেলে এগোতে যাচ্ছিল নিনা, ডোবারে ধমক খেয়ে যেমে পেল।

বাবলি বলল, 'যাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। একটুও ভাবিস না,' ভাইকে আশ্চর্ষ করল সে।

'আমরা যতটা ভাবি আসলে ততটা খারাপ না বাবলি,' যাকে দুচোখে দেখতে পারে না, তার প্রশংসন গদগদ হয়ে উঠল রবিন। 'একআধুন দুষ্টী করে বটে মাঝেসাবে, তবে মনটা খুবই ভাল।'

কেন মতবা করল না মুসা। শুধু বলল, 'পুলিশ নিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে পারলেই হয় এখন।'

নিনা আর বাবলির উত্তেজিত কঠ দূর থেকে দূর নিলয়ে পেল। একবার কী দুবার তন্তে পেল সাইকেলের ঘণ্টা। তারপর আবার সব আগের মত চুপচাপ। বার দুই অজ্ঞানী গলায় কুই কুই করে কিশোরের কোলে মুখ রেখে গোল হয়ে পড়ল টিটু।

'কি হলো রে টিটু, মন খারাপ লাগছে?' আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কিশোর।

আবার আগের মত দয়ে পড়েছে ডোবার। তাকিয়ে রয়েছে লধশদের দিকে। যেন ভাবে, 'দূর, কী কামেলায়ই না পড়া গেল! কয়েকটা পুঁচকে ছেলেমেয়েকে পাহারা দিয়ে মজা আছে?'

বড় করে হাই ভুল রবিন। ভুলতে আরম্ভ করল খানিক পরেই।

'এ-ভাবে বসে থাকতে আর ভালুগাছে না,' মিশা বলল। 'চলো এক কাজ করি, সবাই মিলে গান ধরি। একয়েরাই কাটবে, শীতও কম লাগবে। হয়তো মেডেল রহস্য

৯৫

কুকুরটা শুশি হবে।

বলেই কারও সায় দেয়ার অপেক্ষায় না থেকে গান শুন করল সে। একজন করে গলা মেলাতে লাগল তার সঙ্গে। আরেকবার অবাক হওয়ার পালা ডোবারের। বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা তুলে জোরে একবার ঘাউ করে উঠল। হমকি দিল, না বিরক্ত প্রকাশ করল বোধা গেল না। তাকে বাস্ত করে হেসে উঠল ছেলেমেয়েরা।

'হয়েছে, এবার চূপ করো,' কিশোর বলল। 'পুলিশ আসে কিনা বনি। খানিক পরে বলে উঠল, 'আরি, ইঞ্জিনের শব্দ না!'

## দশ

ঝ্যা, ইঞ্জিনের শব্দই। জোরাল শব্দ, তারমানে পুলিশের গাড়ি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া হেডলাইটের আলোও খুব তীব্র।

দেখতে দেখতে সেই জ্যায়গাটায় চলে এল গাড়ি, যেখানে কিছুক্ষণ আগে এসে দাঁড়িয়েছিল নিনা আর বাবলি।

পুলিশেরই গাড়ি। ইঞ্জিন বক্ষ হতে না হতেই মেট ফেউ শুরু করল ডোবার। বনের গাছে প্রতিধ্বনি তুলল তার ডাক।

বুনোপথ ধরে এগিয়ে এল আরেকটা কালো ভ্যান।

'ওটাও পুলিশের,' মুসা বলল। 'পুলিশ তাহলে সত্যি সত্যি এল আমদের উভার করতে!

অবশ্যি আর বিধায় পড়ে গেছে ডোবার। কী করবে বুবুতে পারছে না। গাড়িকে ভাড়া করবে, না ছেলেমেয়েদের পাহারা দেবে? একবার এদিকে তাকাচ্ছে, আবার ওদিকে। তার সঙ্গে পাশ্চা দিয়ে চেচাচে টিটি।

'নাহ, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার! নিজের হাতে চিমাটি কাটল অনিতা।

বুবুতে পারল, স্বপ্ন দেখছে না সে। বাস্তবেই ঘটছে এ সব। প্রথম গাড়িটা থেকে নামল পুলিশের লোক। পা বাড়াল ছেলেমেয়েদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চাপ গর্জন করে দাঁত বিচাল ডোবার।

হমকে দাঁড়িয়ে গেল দূজন পুলিশ। ভ্যানের দিকে তাকিয়ে একজন বলল, 'এগোনো যাবে না, যেগুরি। কুন্টাটাকে সামলাতে হবে আগে, নইলে কিছুই করতে

ভলিউম ৫৯

পারব না।'

'আরও দুটো!' ভ্যানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ব্রিবিন। দুরজা খুলে গেছে গাড়িটার। 'ওরাও দুটো আলসেশিয়ান নিয়ে এসেছে। যাক, মজা দেখা যাবে কিছুক্ষণ।'

কুকুর দুটোকে আগে নথিয়ে দিয়ে পিছনে নামল একজন লোক। ডোবারের দিকে তাকিয়ে জোরে হাঁক ছাড়ল বিশাল জানোয়ার দুটো। ধড়াস করে উঠল ছেলেমেয়েদের বুক।

'ডোবারের সাথে লড়াই করবে নাকি?' ভয়ে ভয়ে বলল মিশা। 'ওরিক্যাপরে, বাঘের মত লাগছে! দুটোতে মিয়ে ধরলে ছিঁড়েই কেবাবকে।'

'না, কিছু করবে না,' আশ্বাস দিয়ে বলল কুকুর ধরে আছে যে লোকটা। যদি ওই কুকুরটা উল্টোগাঢ়া কিছু না করে। আর তোমাদের কুকুরটাকেও ধরে রাখো। তোমরা ও চৃপচাপ বলে দেখো, কী করে এ-দুটো।'

টিউর কলার ধরে তাকে কান টেনে নিল মিশা। তবে ভয়ের কিছু নেই। টিউর সাড়াশব্দ করছে না। তারচেয়ে বড় দুটো কুকুরের সঙ্গে শক্ততা করার কোন ইচ্ছেই নেই তার।

পরের কয়েকটা মিনিটে যা ঘটল, সহজে কুকুরে পারবে না সাড়টি ছেলেমেয়ে। ডগ-ট্রেনারকে এর আগে কর্বনও কুকুর সামলাতে দেখেনি ওরা। ওদের মনে হলো, কুকুর দুটো আর পুলিশের লোকটা যেন পরম্পরার কথা বুবুতে পারছে। এমনকি সে খুব খোলার আগেই তার মনের কথা বুবুতে নিজে বুজিমান জানোয়ার দুটো।

'কুকুরগুলোকে ছাড়াব এখন,' আরেকবার ছেলেমেয়েদের সাবধান করল ডগ-ট্রেনার। 'তোমার চূপ থাকো। ভয়ের কিছু নেই। নড়াচড়া না করলে ওরা কিছু করবে না। ওরা শুধু ওই কুকুরটাকে আটকাবে।'

হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে। শুন হয়ে বসে সেই আলোয় এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখতে লাগল লধশরা। টিউর এত জোরে চেপে ধরেছে মিশা, ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছাটফট শুরু করল সে। ধীরপায়ে এগিয়ে আসছে পুলিশের কুকুর দুটো। ডোবারের ওপর দৃষ্টি হির, একটা গাছের পোড়ার দিয়ে পিছন করে দাঁড়িয়েছে এখন সে, চোখ চকচক করছে অলোয়া, খুলে পড়েছে লম্বা জিভ। কুকুর দুটোকে আরও এগোতে দেখে চাপা গর্জন করে উঠল।

'আটকা ওকে, বিডি!' আদেশ দিল ডগ-ট্রেনার।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দুই লাকে বিশ্বিত ডোবারের পিছনে চলে গেল বিডি।

'তুইও যা, রকি!' আবার হলো আদেশ।

চোখের পলকে যেন উড়ে গিয়ে ডোবারের সামনে পড়ল রকি।

এদিক ওদিক সরতে চাইল ডোবার, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু কিছুতেই তাকে তা করতে দেয়া হলো না। সারাক্ষণ ভেঙ্গি কাটার ভঙ্গিতে নীরাবে সাঁত বের করে রেখেছে সে। তারপর হঠাতে সামনে দাঢ়িয়ে থাকা কুকুরটার ওপর দিয়ে এক লাফ মেরে বেরিয়ে ছুটে গিয়ে চূকল বনের মধ্যে।

'যা যা, ধরে নিয়ে আয় ওকে!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল ডগ-ট্রেনার।

যৌপকাড়ের ভিতর যেন মন্ত্রমুক্ত ভাস করল তিনটৈ কুকুর। তবে কোন গর্জন নেই, আহতের আর্তনাদ নেই। তারপর ছেলেমেয়েদের চমকে দিয়ে আবার বেরিয়ে এল ডোবার, লাফ দিয়ে এসে পড়ল একবারে ওদের সামনে। ভয়ে চিংকার করে উঠল ওরা। কিন্তু ফিরেও তাকাল না কুকুরটা। ছুটতে লাগল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তার পিছু নিল বিডি আর রকি।

তয় পাছে বটে কিন্তু খেলাটা বেশ উপভোগ করছে ছেলেমেয়েরা।

'আরি, এ-তো একবারে সার্কাস ভুক হয়ে গেল! ফিসফিসিয়ে কিশোরের কানে কানে বলল মুসা।

আবার বনের ভিতর হারিয়ে গেল ডোবার। পিছু নিল বিডি আর রকি। বেরিয়ে এল। আবার চূকল। আবার বেরোল। লুকোচুরি শেলছে দেন। চেঁচিয়ে আদেশের পর আদেশ দিয়ে চলেছে ডগ-ট্রেনার।

আরেকবার খোপের ভিতর থেকে ডোবার বেরিয়েন সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে তার ঘাড়ের চামড়া কামড়ে ধরল বিডি। গো গো করে উঠে আড়া দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করে বার্ব হলো ডোবার। শোভাতে ভুক করল। বিডিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল রকি।

'ধরে রাখ! ছাড়িসনে!' বলল ডগ-ট্রেনার। 'নিয়ে এসো ওকে আমার কাছে! বলতে বলতে এগোল লোকটা। মোলায়েম গলায় বলল, 'এই, কী নামরে তোর? ডোবার, না? এত বাঁদরামী করিস কেন? আয়, কাছে আয়, লক্ষী ছেলে!'

আরেকবার অবাক হওয়ার পালা ছেলেমেয়েদের।  
সামান্যতম প্রতিবাদ করল না ডোবার। সামান্য হোঁড়াচ্ছে। বাধা ছেলের মত এগিয়ে গেল ডগ-ট্রেনারের দিকে। ওর ঘাড় ছেড়ে দিয়েছে বিডি, তবে গী হোয়ে রয়েছে। আরেক পাশ থেকে চেপে এসেছে রকি। যেন অসুস্থ একজন মানুষকে দুদিক থেকে ধরে নিয়ে চলেছে তার দুই সঙ্গী। পুলিশের কুকুর দুটো সেজ নাড়ে বিজীর ভঙ্গিতে।

ডোবারের মাধ্যমে আদর করে হাত পুলিমো দিল ডগ-ট্রেনার। কানের গোঢ়ায় আঙুল ডলল। দেখতে দেখতে তার বাধ্য হয়ে গেল বেয়াড়া কুকুরটা। চিত হয়ে তয়ে চার পা তুলে দিল ওপর দিকে। জিভ বেরিয়ে পড়েছে।

'সর্বনাশ!' হাঁ হয়ে গেছে বব। 'বশ করে ফেলল! আশ্র্য! বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার। ইস, আমিও যদি পারতাম! বুবেছি, বড় হয়ে ডগ-ট্রেনারই হতে হবে আমাকে।'

ওদের দিকে এগিয়ে এলেন একজন পুলিশ অফিসার। বললেন, 'এবার উঠচে পারো। বিপদ কেটে গেছে। গাড়িতে এসে ওঠো, বাড়ি নামিয়ে দেব।' সবার মূখের দিকে তাকাল সে। 'মেয়ে দুটো হস্তদণ্ড হয়ে থানায় গিয়ে খবর দিল।...তা ব্যাপারটা কি? এত রাতে এই বনের মধ্যে কিজন্মে এসেছিলো? আর ওই কুকুরটাই বা আটকে রেখেছিল কেন তোমাদের? কার কুকুর ওটা?'

গাড়িতে উঠে সব কথা খুলে বলল কিশোর। মাঝে মাঝে তাকে কথা জুগিয়ে দিল অন্যের।

বাধা না দিয়ে ওদের কথা শনলেন অফিসার। তারপর জিজেস করলেন, 'লোকচলের নাম জানো? চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে? মনে হয়, ওদেরকেই সুজি আওয়া। কিছুদিন ধরে অতিরিক্ত চুরিভাকাতি হচ্ছে এ-অঞ্চলে। ধরতে পারাই না বাটাদের।'

'ওকজনের নাম হেনরি ডেরিক,' কিশোর জানাল। 'আরেকজনের নিক...একটা সরাইখানার পাশ দিয়ে চলার সময় হঠাতে ঘেমে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'গাড়ি থামন, গাড়ি থামন!' অফিসারের হাত খামচে ধরল। 'মনে হলো হেনরিকে দেখেছি! সামনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল, পিছনে নিক!'

ঝাঁক করে ত্রৈক কলল ড্রাইভার। ঘেমে গেল গাড়ি।

ঠিকই দেখেছে কিশোর। হেনরি আর নিকই। ভিতরে বসে বোধহ্য ঝগড়া করছিল একজন, নিচয় মেডেলতলোর জন্যে। বাইরে বেরিয়েও এখন চেচামেচি করছে, গাল দিয়ে প্রস্তুরকে। পুলিশের গাড়ির পরোয়াই করছে না। কিংবা বুকতে পারেনি পুলিশের গাড়ি।

যখন বুকল, কপালে উঠল চোখ; তখন দেরি হয়ে গেছে। ধরে ফেলা হলো দুজনকে। জিজেসাবাদের জন্যে ওদেরকে থানায় নিয়ে চলল পুলিশ।

কিশোরদের বাড়িতে সবাইকে নামিয়ে দিতে বলল ছেলেমেয়েরা। তা-ই করা হলো। অফিসার বাঁললেন, পরদিন দেখা করতে আসবে আবার।

পুলিশ চলে গেলে বব বলল, 'কিশোর, মেডেলগুলোর কথা ওদেরকে বললে না কেন?'

'কেন বলব? ঘুঁজে বের করলাম আমরা, আর নিয়ে গিয়ে জেনারেলকে দিয়ে বাহ্য নেবে পুলিশ, হয়তো পুরস্কারটাও নিয়ে নেবে, তা কেন হতে দেব? ওগুলো জেনারেলের হাতে দেয়া এখন একজনেরই সাজে, রবিনের। কারণ সে কথা নিয়ে এসেছে জেনারেলকে, মেডেলগুলোকে ঘুঁজে বের করে ফিরিয়ে দেবেই।'

## এগারো

যার যার বাড়ি ফিরে গেল লধশরা।

মুসা ও ফিরে এল। গেটে দেখা হয়ে গেল নোনের সঙ্গে। নিনার সাথে দাঢ়িয়ে আছে বাবলি, উর্ধ্বিঃ হয়ে আছে মুসার ফেরার অপেক্ষায়। দেখেই বলে উঠল, 'ফিরলি! আমি তো ভয়ে মরিঁ...' তারপর মুসাকে অবাক করে দিয়ে যা সচরাচর করে না সে, তাই করে বসল, হাত চেপে ধরল ভাইয়ের। 'যাক, ফিরে এলি! ঘূর পাছিলাম! যা একখান কুতা দেখেছি না...পুলিশকে যখন নিয়ে বললাম, প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে চায়নি।'

চুপ করল বাবলি। ভাইকে ছেঁড়ে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। জিজেস করল, 'মুসা, পুলিশ কী করল গিয়ে?'

কিভাবে ডোবারকে সামলেছে পুলিশের কুরুর দুটো, খুলে বলল মুসা।

'ইস, তাই নাকি!' আফসোস করতে লাগল নিনা। 'যাওয়া উচিত ছিল আমাদেরও। বাবলি অবশ্য বলেছিল, আমিই রাজি হইনি ভয়ে। মজাটা মিসই করলাম।'

'হ্যা, তা করেছ,' বলে গল্পির হয়ে গেল মুসা। 'আমাদের উপকার করেছ আজ, ঠিক, তবে চুরি করে অন্যের লেখা পড়াটা মোটেও উচিত কাজ নয়।'

'জানি,' মাথা নিচু করে ফেলল বাবলি। 'কিন্তু কী করব বল। নিজেকে সামলাতে তো পারি না। তোর নেটুরুকুটা মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখে আর লোভ সামলাতে পারিনি। তুলে নিয়ে পড়ে ফেললাম। তারপর নিনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সাইকেলে করে।'

'যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে তোর এই ছোক ছোক করার

পুত্তোটা যদি একটু বদলাস, খুশি হব।'

'মেয়েরা ওরকম একআধুনি ছোক করেই,' বাবলির পক্ষ নিয়ে কথা বলল নিনা।

'কে বলল? তোমাদের মত মেয়েরাই করে। কই, মিশা তো করে না। ডলি আর অনিতাও না। ওসব কথা থাক। তোমরা আজ আমাদের উক্তার করেছ, সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ। ওই হারামী কুতাটা তো নড়তেই দিচ্ছিল না আমাদের। মনে হচ্ছিল, বসে থাকতে থাকতে পাথর হয়ে যাব।'

পরদিন সকালটা বেশ উত্তেজনার মধ্যে কাটল লধশদের। পুলিশ এল। আরেকবার ছেলেমেয়েদের মুখ থেকে সব কথা অনল। রিপোর্ট লিখে নিল।

'একটা কথা বুঝতে পারছি না,' একজন পুলিশ অফিসার বললেন, 'মেডেলগুলো কোথায়। দুই চোরের একজনের পকেটেও নেই। ওরাও অবাক। বাবু আছে, সেলে নেই, গেল কোথায়?'

'আচর্য!' আবেক দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'তাই নাকি?' মিশা ও অবাক হওয়ার ভাব করে মাথা ঝাঁকাল।

'অবাক কাও!' হেসে ফেলার ভয়ে ডলির দিকে তাকাতে পারল না অনিতা। ডলি ও আবেক দিকে মুখ ফিরিয়ে মুঠকি হাসল।

'অস্তু ব্যাপার!' বলল বব।

মুসা কিছুই বলল না। কিছু বলতে গিয়ে শেষে যদি সব গুবলেট করে ফেলে এই ভয়ে।

অনেকটা উন্ডাস ভঙ্গিতে নিখাস ফেলে টেনে টেনে বলল রবিন, 'ওগুলো কোথায় আছে জানতে পারলে ভাল হত।'

রবিনের এই 'অভিনয় দেখে হাসি চাপতে কষ্ট হলো অন্যদের। কারণ সবাই জানে এরা, তার পকেটেই রয়েছে এখন মেডেলগুলো। তিন্তু পেপারে সাবধানে মোড়ানো। রাতের বেলাই কিশোর তাকে দিয়ে দিয়েছিল ওগুলো। সে নিয়ে গিয়ে দিয়েছিল মায়ের কাছে। মা আলমারিতে তুলে রেখেছিলেন, সকালে আবার বের করে নিয়েছেন।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে পুলিশ চলে গেল।

কিশোর বলল, 'এবার যাও, জলনি নিয়ে দিয়ে এসোগে মেডেলগুলো।'

'আমি একা?' রবিন বলল। 'তোমরা যাবে না।'

'না তুমি একাই যাও। তুমি ফিরিয়ে দেবে কথা নিয়েছো, তোমার যাওয়াই ভাল।'

‘ঠিক আছে।’

এবার আর দেয়াল উপকানের চেটা করল না রবিন। গেট দিয়ে সরাসরি চুকল। বীরন্দৰ্পে। সামনের দরজায় টোকা নিতে খুল দিল নোরা। ‘আরে, রবিন যে?’ এসো এসো। জেনারেল পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন। ওরা চলে যাবে এখুনি। তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন উনি। এসো।’

‘পুলিশ!’ এখানে এখন পুলিশ আসবে, এটা আশা করেনি রবিন। ‘ধাক, তাহলে পরেই আসব...’

‘আরে না না, এসো,’ বলে রবিনের হাত ধরে ফেলল নোরা। ‘এসো, কিছু হবে না। ওরা চলে যাবে।’

বসার ঘরে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন জেনারেল। রবিনকে দেখে হেসে বললেন, ‘আরে, তুমি! কী মনে করে? এসো এসো। আমার মেডেলের বাক্স খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। আশা করছি মেডেলগুলোও পেয়ে যাবে এবারে।’

‘না, স্যার, ওই আশা করবেন না,’ নরম গলায় বলল একজন অফিসার। ‘ওগুলোর কোন খোজাই জানি না আমরা এখনও। বাস্তুটা পেলাম, ব্যস। ভাবলাম নিয়ে যাই।’

‘এই ছেলেটা আবাকে কথা দিয়েছে,’ হেসে পুলিশকে জানালেন জেনারেল, ‘আমার মেডেলগুলো খুঁজে বের করে দেবে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছি। মিথ্যে কথা বলার ছেলে নয় ও। এই তো, পাশের বাড়িতেই থাকে।’

জেনারেলের প্রশংসন্য গর্বে বুর ভাবে গেল রবিনের।

‘বাস্তুটা দেখি তো,’ হাত বাড়াল সে।

ঝালি বাস্তুটা তুলে নিয়ে রবিনের হাতে দিলেন জেনারেল।

ওটা খুল রবিন। পকেট থেকে বের করল কাগজে মোড়া ছেট প্যাকেটটা। ধীরে ধীরে মোড়ক খুলে মেডেলগুলো সাজিয়ে রাখতে লাগল বাস্তুর ভিতর।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না দৃষ্টি পুলিশ অফিসার। চেয়ে আছেন। মেডেল! চকচক করছে সোনার মেডেল! খপ্প না তো?

চেয়ে আছেন জেনারেলও। তবে অবাক হননি। হাসিটা শুধু বেদেছে। বিশ্বিত পুলিশ অফিসারদের দিকে তাকিয়ে শান্ত কষ্টে বললেন, ‘কি, বসেছিমান না? এখন দেখলেন তো? বের করে দিলাই। খুব ভাল ছেলে। পুরুষার ওর পাওয়া উচিত। পাঁচশো ভলার।’

‘না না,’ থ্যাঙ্ক ইউ, তাঢ়াতাঢ়ি বলল রবিন। ‘পুরুষার আমার লাগবে না। আপনার জিনিস ফিরিয়ে দিতে পেরেছি, এতেই আমি খুশি। টাকার দরকার নেই।

আমার।’

‘কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে,’ গভীর হয়ে জিজেল করলেন একজন অফিসার। ‘পেলে কোথায় এগুলো?’

‘একটা গাছের ষাঁড়লে,’ হাসিমুখে জবাব দিল রবিন। পুলিশদের এই অবাক হওয়াটা উপভোগ করছে সে।

‘তুমিই নিয়ে শিয়ে রেখেছিলে নাকি?’

‘আমি কেন রাখব? চোরের রেখেছে। আমরা খুঁজে বের করেছি।’ বক্সদের সহায়তা কিভাবে করে করেছে তাই আর কিশোর, সেকথাও জানান। নিজের হাতে ওগুলো জেনারেলের হাতে তুলে দেলার ইচ্ছে ছিল বলেই ওগুলোর কথা পুলিশের কাছে এত্তে গেছে, বলল সেকথা। তবে মুখ কালো করে মেডেলেন অফিসারের।

মেডেলগুলো আবার ফিরে পেয়েছেন জেনারেল, আনন্দ আর ধরে না। চেমেচিট তুর করে দিলেন, ‘নোরা, এই নোরা, জলদি চা-বিস্কুট দিয়ে যাও! আমার মেডেল ফিরে পেয়েছি। জলদি করোৱা।’

চা খাবার জন্যে বসে থাকলেন না অফিসারের। রবিনকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে নিষিদ্ধ হয়ে নিলেন, মেডেলগুলো সে চুরি করেনি। তারপর জেনারেলের কাছ পেতে বের করিয়ে দেবে বলে গেলেন।

বার বার রবিনের প্রশ্নে পেল রবিন। বলল, ‘বলল, ‘আসলে, এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই।

আমি কিছুই করিনি। আমাদের ভাগ্য ভাল, সে-জন্মেই পেয়ে গেছি। পুরোপুরি কাকতালীয় ব্যাপার।’

‘আমি তা মনে করি না। মানুষ মনেপ্রাণে যদি কোন জিনিস চায়, সেটা সে করতে পারেই। তুমি তোর গলায় বলেছ আমার মেডেল ফিরিয়ে দেবে, বলায় কোনো বিধা ছিল না, তাই সেটা করতে পেরেছ। তোমার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। মন থেকে কোন জিনিস চাইলে কোন না কোনভাবে সেটা পেয়েই যায় মানুষ।’

সারাটা শিল মেডেলগুলো নিয়ে বুন হয়ে রাইলেন জেনারেল। বিকেলের দিকে

নোরাকে ডেকে বললেন, ‘ছেলেমেয়েগুলোর জন্মে কিছু করা দরকার। পুরুষার নেয়ানি। একটা কৃতৃর ও আছে ওদের সঙ্গে।’

‘চিনি। টিটু। কী করবে চান?’

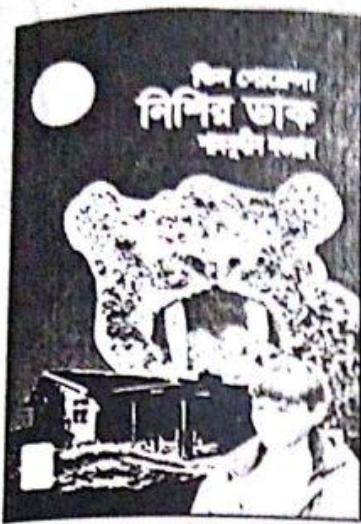
‘একটা পাঁচি দিলে কেমন হয়?’

‘খুব ভাল।’

মেডেল রহস্য।

‘আরেকটা কাজ করতে চাই। আমার একটা মেডেলের উল্টো পিঠে ওদের  
ক্লাবের নাম খোদাই করে ওদেরকে উপহার দিতে চাই। কী বলো?’  
‘খুব ভাল হবে। ওরা খুব খুশি হবে। কবে পার্টি দিতে চান?’  
‘আগামীকাল?’  
‘ঠিক আছে। যাই। দাওয়াতটা দিয়ে আসি ওদের।’

\*\*\*



## নিশির ডাক

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

‘আমরা ওকে যুব্যান বলে ডাকি।’

মেয়েটির দিকে ঘুরে তাকালাম। আমার খানিকটা দূরে, কিশোর আর মুসার পাশে অ্যাম্বুলেন্সের কাছ ঘৰ্যে দাঢ়িয়ে রয়েছে ও। রাস্তার ওপাশের বাড়িটায় মেয়েটিকে দেখেছি আমি। এখানকার বই মেলাতেও দেখা হয়েছে একবার। এক মাথা

কালো চুল আর ডাগর কালো চোখ মেয়েটির। বয়স আমাদেরই মত।

নীল বাতি, ঝলসাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সটা। সেদিকে চেয়ে ছিলাম আমি।

‘কেউ আসল নাম জানে না কিনা তাই সবাই ওকে যুব্যান বলে ডাকে,’ বলল মেয়েটি।

আমি এবার ঊ কুঁচকে চাইলাম ওর দিকে। নতুন শহরে বেড়াতে এসে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চাইছি না। কেননা বন্ধুত্ব দ্রুত জমে ওঠে, তারপর বিদায় নেওয়ার সময় ভয়ানক খারাপ লাগে।

কিজারভিলে আমার জুলি খালার বাসায় বেড়াতে এসেছি আমরা।

‘ওকে কেন অমন অস্তুত নামে ডাকা হয় জিজেস করলে না?’ প্রশ্ন করল মেয়েটি। গলা শুনে মনে হলো আমাদের অনাগ্রহ ওকে আহত করেছে।

ব্যাকপ্যাকটা হাত বদল করে মেয়েটির দিকে ভাল করে আবারও চাইলাম আমি। চোখ পিটপিট করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও।

কিশোর জিসের পিছনের পকেটে একটা হাত চুকিয়ে দিল।

‘উনি নিশ্চয়ই চিড়িয়াখানায় কাজ করেন?’

মাথা নেড়ে মৃদু হাসল মেয়েটি। তারপর দেয়ালের উপরদিকে আঙুল নির্দেশ করল।

মুখ তুলে চাইলাম। পাথর ও মেঘলা আকাশ ছাড়া আর কিছুর দেখা পেলাম না।

‘দেখতে পাচ্ছ না? কয়েকটার মাথা দেখা যাচ্ছে তো। দেয়ালের চুড়োর

কাছে। আমার বাসায় চলো, আরও ভাল মত দেখতে পাবে। ওদেরকে টপিয়ারি  
বলে, 'দেয়ালটা আবারও ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল।

'টপি কী?' মুসা জবাব চাইল।

'টপি-পিয়া-রি,' ভেঙে ভেঙে বলল মেয়েটি। 'গ্লাস্টগুলোকে এমনভাবে কাটা  
হয় যার ফলে পাতাগুলো বিভিন্ন প্রাণীর আকার নেয়। ওই দেখো...'

ড্রাগনের মাথার অকৃতির সুবৃজ এক পিও আঙুল দিয়ে দেখাল ও। মুখটা হা  
হয়ে রয়েছে ওটোর।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

'ওপর দিকের ও দুটো হচ্ছে কান, ওটা নাক, আর ওই বাস্পগুলো ওটোর  
মেরুদণ্ড। দারিদ্র্য না?'

'হ্যা,' শ্রাগ করে এগোলাম রাস্তা দিয়ে। কিশোর, মুসা আর মেয়েটি অনুসরণ  
করল আমাকে।

'ইয়ার্টে ছোট-খাট ওরকম আরও আছে। খুবই সুন্দর একেকটা।'

'ও, তাই খুবি,' বললাম। ভয় পাইছি ঠিক তা নয়, তবে কেমন জানি এক  
অবস্থিক অনুভূতি হচ্ছে।

'কী ধরনের প্রাণী?' জানতে চাইল গোয়েন্দ্রাধান।

'কাল্যানিক বলতে পারো। এই ধরো, বিশাল থাবাওয়ালা ভালুক, কিংবা  
ডানাধারী সিংহ...'

'জাস্ট জানোয়ার কিছু নেই? বড়ল-টিভাল?' জিজেস করলাম।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি।

'গাছেরও তো জীবন আছে। তবে বিড়াল আছে কি না জানি না।'

ঠাইঠাই চোখের কেনাদে সাদা এক ঝলকানি দেখতে পেলাম।

'সাবধান,' বলে মেয়েটিকে এক টানে সরিয়ে আনলাম।

দুজন অ্যাম্বুলেন্স কর্মী গেট দিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে এল, বাড়িতে যেন  
আগুন লেগেছে।

চাকা লাগানো এক স্টেচার টানছে একজন, অপরজন ঠেলছে। চিরুক পর্যন্ত  
কখলে চাকা এক বৃক্ষ ওয়ে স্টেচারের উপর।

'গেটটা একটু বক করে দেবে?' সামনের জন বলল।

আমি মাথা নেড়ে লোহার কালো হাতলটা চেপে ধরলাম। দু'হাতে ঠেলে  
ওটাকে লাগাতে হলো। পরাক্ষমে ঘুরে দাঁড়ালাম।

আর তখনি শুনতে পেরাম বুড়ো লোকটার কথা।

'যেতে পারব না...যেতে দেবে না...ওরা...খাওয়াতে হবে... জানোয়ার...  
খাবার...'

লোক দুটোর দিকে মুখ তুলে চাইলাম। জিজেস করতে যাচ্ছিলাম ইয়ার্টে  
কোন কুকুর-বেড়াল রয়েছে কি না, কিন্তু ওদের ব্যস্ততার কারণে তা আর পারলাম  
না।

নিল বাতি বলসাছে। তীক্ষ্ণ সাইরেন বাজিয়ে চলে গেল আয়াব্লেস।

বৃক্ষকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর কিশোরের দিকে চাইল মেয়েটি।

'তামার কী যানে হয়, উনি কি প্লাস্ট-অ্যামিনেলগুলোর কথা বলছিলেন?'

শ্রাগ করল কিশোর। হেঁটে গেল গেটের কাছে। আমিও গেলাম।

গেটটা যখন লাগাই তখন কোনভাবে নিচয়ই লক হয়ে গেছে। হাতল ধরে  
টান দিলাম, নড়ল না।

'ধরো তো,' বলে মেয়েটির কাছে ব্যাকপ্যাকটা দিলাম।

প্রায় দশ ফুট বাড়া দেয়ালটা। একটা অংশের পাথর ভাঙা।

'বাস এলে আমাকে ভাঙা দেয়াল,' বললাম। তারপর দেয়াল বেয়ে ঝটপট  
উঠতে শুরু করলাম। টোর দিলাম কাজটা সহজ নয়।

দেয়ালের মাথায় কুই দুটো যখন রাখতে পারলাম, তখন হাপরের মত  
হাঁপাচ্ছি। শরীরটা তুলে নিয়ে দেয়ালের উপর লাদালবি শুয়ে পড়লাম। অমসৃণ  
পথরে কুই ছড়ে গেল, কিন্তু পাতা দিলাম না। বুড়োর ইয়ার্টের সব কিছু এমুহুর্তে  
পরিষ্কার দৃশ্যমান আমার সামনে।

'কী দেখলো?' প্রশ্ন করল মুসা। ও আর কিশোর নীচে দাঢ়িয়ে মেয়েটির  
মন্দে।

মেটি বাঁচাটা গাছ-জুঁজ ঘণে ক্ষমত দিলাম আবি। গেটটা ইয়ার্ট জুড়ে দাঁড়িয়ে  
যায়েছে ওরা। বন্ধুদেরকে জানালাম সে কথা। অস্তুত সব জুন্ত। কোন কোনটা  
নানবীয়।

তাদুর্বল্টাক দেখলাম, মেয়েটি যেটাৰ কথা বলেছিল। আকারে জ্যাত  
ভালুকের ঝিপ্পণি। প্রাকাও থাবা দুটো পেকে কাঠের ছোরার মত বেরিয়ে আছে নগু  
ভাল।

অতিকার ঘনকালো এক ঝোপকে বাথের আকৃতি দেওয়া হয়েছে। বড় বড়  
দুটো বাঁকা দীন্ত দেখিয়েছে ওটো।

ডানাওয়ালা সিংহটাকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু সামনাসামনি দেখতে  
পেলাম ড্রাগনটাকে। হলদে-সুবৃজ এক উত্তিন থেকে জয়েছে। চারটে শিকড়।

প্রতিটা শিকড় একটা করে পায়ের কাজ করছে। ডানা দুটো আর দাঁতগুলো হোট। ইন্দু-সবুজ পাতার কারণে দেখে মনে হয় অসংখ্য কঁটা ধারণ করে রয়েছে। বাতাসের দেলায় পাতা নড়ে উঠতে মনে হলো বৃষি খাস নিছে ড্রাগনটা।

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখছি, টের পেলাম গলা শুকিয়ে কাঠ। এতক্ষণ হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম গাছ-জুন্ডগুলোকে।

বাতাসের ঝাস্টায় চোখের উপর এসে পড়ল চুল। পাতার নড়াচড়া অন্তু এক ফিসফিসানির শব্দ তুলে। উঠিদগুলো যেন কথা বলছে। ঘাড়ের কাছে চুল দাঁড়িয়ে গেল আমার। ধড়স করে উঠল বুকের ভিতরটা। আশ্চর্য এক অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ বৃষি ইয়াতে ছিল, এইমাত্র আমার দিকে ঝট করে চোখ তুলে চেয়েছে।

## দুই

'অ্যাহ, রবিন, বাস আসছে!' মুসার গলা।

নীচের দিকে তাকাতেই তাল হারালাম। পড়ে গেলাম পিছনদিকে। দেয়ালটায় থাবা মারলাম। উপরদিকটা আঙুলে ঠেকল। পা একটা পাথর খুঁজে পেল মুহূর্তের জন্য ঝুলে রইলাম। এবার অপর পা-টাও পাথরে রেখে নেমে যেতে লাগলাম।

'জলনি এসো!' জরুরী কষ্টে চেল কিশোর।

'তোমরা চলে যাও,' আমি পরে আসছি' ওপর থেকে পাঞ্চ চিংকার ছাড়লাম।

বই মেলায় যাচ্ছিলাম আমরা। আমার ব্যাকপ্যাকটা রয়ে গেল মেয়েটির কাছে। থাকুক, অস্বিধে নেই।

কিশোর আর মুসা নিচ্ছাই বিধায় পড়ে গেছে যাবে কি যাবে স্তু।

'আমার জন্য ভেবো না, তোমরা যাও,' আবারও বললাম আমি। 'পরে দেখ হবে।'

ওরা দোড়ে গিয়ে বাসে উঠে পড়ল। বাসটাকে চলে যেতে দেখলাম।

হাতের পিঠ আর আঙুলের চামড়া ছড়ে গেছে। দেয়াল থেকে নামতে গিয়ে জিন্দটাও গেছে ফেসে। সব দিক থেকে ক্ষতি।

বই মেলাতে আর যাইনি। সারাটা বিকেল কেটে গেল বুড়োর কথা ভেবে। গাছগুলো ছাড়া বুড়োর আর কি কোন জীব-জানোয়ার আছে? তাল মত একবার দেখে আসা দরকার। আমি ঠিক জানি, আমি কাউকে দেখেছি এবং আমাকেও কেউ দেখেছে।

বাড়ি ফিরে দরজা লাগাতেই টের পেয়ে গেলেন জুলি খালা।

'রবিন, দিবলি?' ঠেটিয়ে উঠলেন। 'এদিকে একবার আসবি, বাবা?'

বুখালাম তাঁর কোন কাজ আছে। দেকান-টোকানে যেতে হবে।

প্রাণ ডিনারের সময় পর্যন্ত নানা টুকিটাকি কাজে বাত থাকতে হলো আমাকে। তারপর সুইস আর্মি নাইফটা জ্যাকেটের পকেটে পুরলাম। আরেক পকেটে এক ক্যান টিউন শুকিয়ে ভরে ফেললাম। এবার পিছনের দরজা দিয়ে নেরিয়ে এলাম। জুলি খালাকে আওয়াজ দিয়ে এসেছি বাইরে হাওয়া খেতে যাচ্ছি।

কিশোরের মেলা থেকে এখনও ফেরেনি। সূর্য ঢুবে গেছে। স্ট্রাইট লাইটগুলো সবে জুলে উঠলৈ।

মাথার উপরে লাল আর পাশে হলদে সং ধরেছে আকাশ। দেয়াল বেয়ে ওঠা আর ভিতর থেকে গেট খুলবার জন্য বৃষি বেশিক্ষণ আলো পাব না আমি।

দেয়ালটার দিকে চেয়ে রইলাম দু'মুহূর্ত। মনকে বোঝালাম পারব। এবার বাইতে ঝুঁক করলাম।

বিকেলের চাইতে কাজটা সহজ লাগছে এখন।

উপরে হাত ঠেকবার পর এক ঝটকায় তুলে ফেললাম শরীরটা। এখন বসতে পারব।

ওনতে পেলাম গাছের পাতা হিস-হিস শব্দ করে কাকে যেন চুপ করতে বলছে।

এবার নীচে ইয়ার্ডের দিকে চোখ রাখলাম।

দৃষ্টি সরিয়ে আনলাম পরমহৃতে। মনে হলো যেন নীচের জমিটা স্বেচ্ছ উধাও হয়ে গেছে। পড়ে রয়েছে কালো এক গহ্ন।

দেখতে পাইছি গহ্নের থেকে মাথা তুলেছে আশ্চর্য গাছগুলো। আমার পিছন থেকে আসা রাস্তার আলোয় ভুত্তড়ে আকার নিয়েছে ওগুলো। পাতাগুলোকে এখন আর পাতার মত দেখাচ্ছে না। বরঞ্চ ওগুলোকে এমুহূর্তে নিরেট দেহ বলে মনে হচ্ছে। শিউরে উঠে জ্যাকেটটার মধ্যে ওটিসুটি মারলাম। এগুলো উত্তিদ বই তো নয়, স্বেচ্ছ উত্তিদ-নিজেকে সাহস দিলাম।

আমার প্ল্যান ছিল কোন একটা টিপিয়ারি গাছ বেয়ে নেমে যাব। পা বাড়ালেই

জ্বাগন্টার নাকের উপর দীড়াতে পারি। কিন্তু বিকেলে দেখা চোখা ডালগুলোর কথা ভেবে ও পথ মাড়ালাম না। নিজেকে বোঝালাম, আমি আসলে ডালের খোঁচে চাই না—বাস, আর কিছু না। কিন্তু সত্ত্ব কথা বলতে কি, জ্বাগন্টার কেটা দাঁতের ধারে কাহেও পা নিয়ে যেতে চাই না।

কাজেই শরীর শুরুয়ে নিয়ে পাথর বেয়ে নামতে শুরু করলাম।

নামটা শুব্দে কঠিন হলো। পা গেল পিছলে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে আরেকটা পাথরে বাখবার চেষ্টা করলাম জ্বাগন্টা।

আবার সেই গা ছমছমে অনুভূতিটা ফিরে এল।

কী যেন গোপনে লক্ষ করেছে আমাকে। এবং এখনও করছে।

ঘূরে তাকালাম। নখ দাবিয়ে দিলাম পাথরের খাঁজে। মাটির দিকে চেয়ে বইলাম যতক্ষণ না চোখ টেন্টন করে উঠল। অবশ্য সবজ ছায়া আর কিছু চোখে পড়ল না আমার। বাতাসে চুল উড়ে এসে পড়তে চোখে, জ্বালা করতে খোঁচে। হাত দুটো ছিঁড়ে পড়তে চাইতে খুলে থাকতে থাকতে। নামতে হবে এবার। দমকা হাওয়া দিয়ে। ঘটাখট শব্দ করতে ভাল।

হাঁচেই আমার পিষ্টে বাঢ়ি মারব গাহের একটা শাখা। আরেকটা ডাল চাবুক কষাল দুঁহাতের উপর—তাঁকু নখে আঁচড়ে কঠিল যেন। তারপরে চিক্কার ছাড়ালাম, কিন্তু দেয়াল আর বাতাস টিপে মারল শব্দটাকে।

ঝুলে থাকতে চাইলি, কিন্তু পারলাম না। পিছলে গেল আঙুলগুলো। আরেকটা পাথর ধরতে চাইলাম শক্ত করে, হলো না।

মস্ত পাথরে পিছলে গেল হাত।

পড়ে যাচ্ছি আমি।

## তিনি

মাটিতে ধপাস করে পড়তেই বুকে চেপে রাখা দমটুকু বেরিয়ে গেল। মনে হলো কেউ কুঁধি আমার বুকে ভারী দুটো পা চাপিয়ে দিয়েছে। হাড়-টাঢ় ভাঙলে বেলেক্ষরির আর শেষ থাকবে না। বেড়াতে এসে খালা-খালুকে বিপদে ফেলা কোন কাজের কথা নয়। যাক সেকথা, মুখ দিয়ে খাস টেনে উঠে বসলাম আমি।

দেয়ালের এপাশ থেকে আকাশটাকে আরও কালচে দেখাচ্ছে। আশপাশে উঙ্গিশঙ্খে ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

স্টান উঠে দাঁড়ালাম। চেষ্টা করছি শাস্ত থাকতে। কেন তা জানি না, কিন্তু মন বলে।

ইয়ার্ড থেকে বুড়োর বাড়িটা পর্যন্ত দেখবার উপায় নেই, গাছ-পালার সংখ্যা একটাই বেশি। আর মাটিতে দাঁড়িয়ে গাছগুলোকে বেয়াড়া রকমের লম্বা বলে মনে হচ্ছে।

‘এই, কিটি,’ গলা খাদে নামিয়ে বিড়ালটাকে ডাকলাম। অত ত্যা পাচ্ছি কেন? এবার গলা একটু চাঁড়িয়ে ডাকলাম, ‘এই, কিটি।’

বাতাসে মর্মর শব্দ তুলল চারপাশের ঘোপ-ঘাঢ়।

ঠিক করলাম ডাকজড়ি না করে চারপাশে ঘুরে দেখব।

বুড়ো মানুষটা যান্ত করে বুনেছেন তার জানিয়ারগুলোকে—তাঁর টপিয়ারি-ফলে ইয়ার্ডে প্রত্তোকের জন্য নিজস্ব বাড়তি জমি রয়েছে।

আমি ওগুলোর মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলাম। যথাসম্ভব দ্বরুত্ব বজায় রাখছি। কাছ থেকে এগুলোকে আরও ভ্যাক্স দেখাচ্ছে। গা-টা কাঁচা দিয়ে উঠল। মনে হলো একটা তর্ময়োপেকা ঘাড়ের কাছ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

কে যেন লক্ষ করেছে আমাকে।

এবার মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেলাম।

বাড়িটার ঠিক সামনে। আমার তিনটের সমান। হা-টা একটাই বিশাল ওটার, আমি চাইলেই মাথা গলিয়ে দিতে পারি। কী জাতের উঙ্গিদ ওটা চিনতে পারলাম না, কিন্তু বুড়ো ওটাকে যে আকাশ দান করেছেন তা চিনতে কঠ হলো না। নিংহের মত চেহারা। ভানাধারী বিশালকায় এক সিংহ।

হাঁ করে চেয়ে আছি তে চেয়েই আছি।

একটা থাবা বাড়ানো ওটার, এই বুঝি মেরে বসবে আমাকে। বুড়ো-মানে মুম্যান এমনভাবে ডাল কেটেছেন যার ফলে দেখে মনে হবে সিংহটার থাবায় নখের রয়েছে। পাতাখাল থাবা থেকে সত্ত্বিকারের নখ বেরিয়েছে যেন।

রাস্তার অলোচন চকচক করছে কাঠের নবগুলো, সাদা আর তীক্ষ্ণ। ‘ওটা স্ট্রেফ একটা প্র্যাক্ট বই তো নয়,’ মনে মনে আওড়ালাম। পকেটে তার দিলাম দুঁহাত। সুইস আর্মি নাইকে চেপে বসল মুঠো। মনে খানিকটা বল পেলাম।

হেরায় এক হাত রেখে অপর হাতটা বের করে ফেললাম। আমি প্রমাণ করে

দেব এটা নিছকই এক উন্নিদি।

ওটার দিকে চোখ রেখে এগিয়ে গেলাম। আলতো করে একটা পাতা স্পর্শ করে এক ঘটকায় হাত সরিয়ে নিলাম। যেন তত হাঁড়ির ছাকা গেয়েছি। কিছুই ঘটল না। হাত বাড়ালাম আবারও, তব খানিকটা কমেছে। এই নিম্নদ পরিবেশে অস্তু এক উত্তেজনা অনুভব করছি। কোনভাবে উচু হাত দাঁড়ানো গেলে মুঠো স্পর্শ করতে পারতাম।

'আউ!' এক টানে হাত সরালাম। ধারাল কী যেন পোচা মেঝেছে আঙুলে। মুখে আঙুল পুরে রক্তের স্বাদ পেলাম। কাঁটা লেপেছে নিশ্চয়ই, ভাবলাম। আলগোছে সরে এলাম।

ইয়ার্ডের চারধারে নজর বুলাচ্ছি, অবশ্য জনাধারী সিংহ-গাছটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। ভাল লাগছে না আমার। একটা গাছকেও সুবিধের মনে হচ্ছে না। বিশেষ করে এই সিংহটাকে।

কোনার দিকে এক ইস্পাতের শেড দেখতে পেলাম।

শেডের দরজা খোলা, কিন্তু ভিতরে অভটাই অক্ষরকার-কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ইস, খালুর বড় ফ্ল্যাশলাইটটা কেন যে আনলাম না, কিংবা আমার পকেট লাইটটা।

দরজা ঠেলে খুলবার পর আধার খানিকটা কমল। তবে একটা হেট বস্তা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। ওটা টেমে বাইরে বের করে চোখের সামনে তুলে ধরলাম, জিনিষটা কী দেখবার জন্য।

হাড়ের ওঠোঁ।

কালো পোটা পোটা হয়েক দেবেলটা লেখা হয়েছে। পুরানো হাড়ে যেমন হয় তেমনি এক ছাতাপড়া, শুকনো গুঁফ। ভক্ত করে নাকে এসে লাগল। বস্তার মুখ বৰ্ক করে শেডের ভিতর আবার রেখে এলাম।

আচমকা বাস-বস শব্দ উঠল পিছন দিক থেকে।

চৰকির মত ঘূরে দাঁড়ালাম। বাতাসের শব্দ এটা নয়। হলে অনুভব করতাম। অন্য কিছু একটা নাড়িয়ে উন্ডিদের পাতা। পকেটে হাত ভরলাম আবার। ইয়ার্ডে দৃষ্টি মেলে দিলাম, কিন্তু কোন কিছুই নড়তে দেখলাম না।

ইটু 'গেড়ে বসে ছোরা' আর টিউনার ব্যান্টা বের করলাম। ক্যানটা খুলাম। শেডের সবচাইতে কাছের গাছটার পাশে রেখে দিলাম ওটা। বুড়ো হয়তো বা পোষা বেড়ালটার জন্য শেড খুলে রেখেছিলেন। মানে আমার তাই ধারণা আরকী।

এবার গেটের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

ইটুই আর কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাচ্ছি। বাতাস বইতে শুরু করেছে আবার। পাতার শব্দ শুনে মনে হচ্ছে লোকজন শিঁ শব্দে কথা বলছে।

ঘূরে দাঁড়ালাম, সিংহ-গাছটিকে যাতে দেখতে পাই। আমি মনে প্রাণে চাইছি ওটা বাড়ির পাশে বসে থাকুক। ডানা মেলে, মাটি কুঁড়ে উড়াল দিলেই সর্বনাশ।

দেখতে পেলাম ওটা যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। হঠাৎ বাহতে ডাল-পাতার ঘৰা অনুভব করলাম।

ডাক ছেড়ে এক লাফে পিছিয়ে এলাম। পায়ে পা বেধে পড়ে গেলাম হোঁচ্টে যেয়ে। মুখ তুলে অতিক্য ভালুকটার দিকে চাইলাম। গেটে যাওয়ার পথ আগলে রেখেছে ওটার বাহু। আমি সোজা এসে পড়েছি ভালুকটার সামনে।

ধড়াস-ধড়াস বাড়ি পড়ছে বুকের ভিতর, উঠে দাঁড়ালাম, দোড়ে গেলাম গেটের কাছে। একবারও পিছু কিনে চাইলি। ভালুকটা ঘূরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেছে কিনা বেং জানে।

এতটাই জোনে দৌড়েছি, কাঠের গেটে দড়াম করে আছড়ে পড়লাম। ধাতব ল্যাচ আঁকড়ে ধৰল আমার হাত। ল্যাচ পেঁচিয়ে ধরতে পারলাম দু'বারের টেক্টায়। এবার ঠেলা দিয়ে খুলাম পেটটা। আরেকটু হলেই হমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম সাইডওয়েকে।

বাইরে বেরিয়ে, স্ট্রাই লাইটের নীচে এসে ঘূরে দাঁড়ালাম।

নিজেকে আন্ত এক গৰ্দন মনে হলো। গেট দিয়ে ঠিকরে আসা বাতির আলোয় গাছগুলোকে নিছক গাছের মতই দেখাচ্ছে।

ভালুকটা ঘূরে দাঁড়ায়নি। আমি নিজেই ওটার কাছে গিয়ে খামোকা ভয় পেয়েছি।

আধারে উকি দিয়ে জনাধারী সিংহটাকে খুঁজলাম। বাসার পাশে বসে ওটা, সামনে থাবা দুটো ভাঙ্গ করা। ডানা দুটোকে এখন স্বেক লতার মত দেখাচ্ছে, অন্য কিছু না। আমি বোকার মত ভেবেছিলাম একটা থাবা বুঁকি শূন্যে তুলেছে ওটা।

গেটটা ভেজিয়ে দিলাম। এমনভাবে লাগিয়েছি যাতে লক হয়ে না যায়। এবার বাড়ির পথ ধরলাম।

'ব্যাগটা নেবে না?'

বই মেলায় আজও এসেছি আমরা। বিশাল মেলা তো, প্রচুর বই। ঘূরে ঘূরে ৮-নিশির ডাক

দেখা, বাছাই করে কেনা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবু পছন্দ করে গোটা চারেক বই কিনেছি আমি। কিশোর আর মুসাও কিনেছে।

ক্যাট্টিনে বন্দে স্যান্ডউইচ চিবাচ্ছিলাম আমরা, মুখ তুলে চাইলাম। কালকের সেই মেয়েটি।

‘আমদের স্টলে তোমার ব্যাগটা খাবা আছে,’ জানল। ‘তোমার বকুলের হাতে দিত পারতাম কিন্তু নিইনি। তুমি যেহেতু আমর হাতে দিয়েছিলে। ওরা নিশ্চাই বলেছে?’

মাথা ঝাঁকালাম আমি। একটু পরেই ব্যাগটা আমাতে যেতাম মেয়েটির বাবার স্টল থেকে। ভদ্রলোক একজন প্রকাশক। কিশোরদের মূল্য বেনেছি।

চলে গেল মেয়েটি। খানিক বাদে ফিরে এল আমার ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে।

‘ধন্যবাদ,’ বললাম। ব্যাকপ্যাকটা আমার পাশে নামিয়ে রাখলাম।

মুসা মেয়েটির দিকে চাইল।

‘স্যান্ডউইচ চলবে?’ মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বলল।

নাক ঝুঁচকাল মেয়েটি। মাথা নেড়ে বেরিয়ে ওপাশে বসল।

‘আমার কাছ থেকে অর্ধেকটা দীনাটা বাটার যদি নাও তবে তোমার অর্ধেকটা আপেল নিতে পারি।’

মুসার সঙ্গে খাবার পাঞ্চাপাণি হলো। আপেল চিবাবার ফাঁকে নিজের পরিচয় দিল মেয়েটি।

‘আমার নাম স্যালি।’

‘আমি রবিন, ও কিশোর আর মুসা। আমরা তিনি বকুল।’

‘তোমার নাম জানি,’ আমাকে লক্ষ্য করে বলল। ‘ব্যাকপ্যাকে লেখা আছে। আজ্ঞা, যুম্যানের ইয়ার্টে কেন বিড়াল-তিড়িল পেলে?’

‘বাওয়া ভুলে ও দিকে ফ্যালফ্যাল করে ঢেয়ে রাইলাম।

‘অবাক ইছে কেন? তোমাকে উর ইয়ার্টে নামতে দেবেছি। আমার ঘর থেকে সব দেখা যায়। সিড়ির মাথায় কিনা।’

‘আজ্ঞা, হাসপাতালটা কোথায়, জানো?’ গোয়েন্দাপ্রধান প্রশ্ন করল। বকুল আমার মুখে কাল রাতের অভিযানের কথা সবই বলেছে।

‘কেন?’ জিজেস করল স্যালি।

‘ওকে দেখতে যাব আমরা।’

‘কাকে যুম্যানকে?’

‘ইয়া। ওকে উর শোষা জানোয়ারের কথা জিজেস করব।’ বললাম আমি।

আজ সকালেও বৃক্ষের ইয়ার্টে নিয়ে দোড়িয়েছি আমি। দিনের বেলা মোটেও ভয় করেনি। গেট খোলা থাকায় ভিতরে আসা-যাওয়া করা কেন ব্যাপারই নয়। তারপরও বেশিক্ষণ ধার্কিনি আমি। টিউনা কানাটা ওখানে নেই জানবার জন্য ঠিক মেট্রু সহয় দাকা দরকার ছিল। টিউনা খেয়েছে কেন এক প্রাণী। এবং ক্যাট্টিকেও টেনে নিয়ে বৃক্ষের বেড়াল হয়তো একটা নয়, কয়েকটা। তারই একটা ক্যান টেনে নিয়ে গিয়ে টিউনা সাবক্রেছে। বকুলের সামনে একদৃষ্টি বললাম। আমি স্বৰ একটা নিশ্চিত নই কে খেয়েছে টিউনা। সেজনাই আসলে যুম্যানের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

‘ওখানে কীভাবে যেতে হয় জানি আমি,’ বলল স্যালি। ‘শহরের শেষ পাসে বাস থেকে নামলে বাকিটু হৈটে যাওয়া যাবে।’

কিশোরকে নিশ্চিত দেখলাম। হয়তো স্যালিকে সঙ্গে দেখে কি ন ভাবছে। শেষধৰ্শ মাথা ঝাঁকাল। তার মানে রাজি। আমরা ও কেউ আগতি করলাম ন।

আমরা যা ভেবেছিলাম তার চাইতে হাসপাতালে হৈটে যেতে বেশি সময় লাগল। প্রায় গাঁয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা।

হাসপাতালের পিছনে পাইন গাছের সাথি। বনভূমির সীমানা নির্দেশ করছে।

স্যালিকে রিসেপশনে অপেক্ষা করতে বললাম। আমার ব্যাকপ্যাকটা রাখতে নিলাম ওর কাছে।

গোলাপি-সাদা পোশাক পরা এক মহিলা বনে ছিলেন ভেক্সে। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি আমদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। আব ঠিক ভুনি কেন জানি আমর বৃক্ষের ভিতরটা ছ্যাত করে উঠল। মনে হলো আমেলায় ভাড়াতে চলেছি।

‘কী ব্যাপার বলো?’

কী বলব, যুম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই? বৃক্ষের নামটাও তো জানি না ছাই। পিছনের পকেটে দুঃহাত ভরে দিলাম।

এগিয়ে এল গোয়েন্দাপ্রধান।

‘উম...কাল এক বৃক্ষ ভদ্রলোককে এখানে আনা হয়েছে। ...আমরা উর প্রতিবেশী।’ আমার মার সঙ্গে মহিলার চোখের ভাবের অন্তুত মিল দেখতে পেলাম। আমার মা বৰ্বন আমার কোন অনুরোধ মোলায়েমভাবে ফিরিয়ে দেন তখন তাঁকেও ঠিক এমনি দেখাবে।

নামটা বলতে পারবে?’

আমরা পরম্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। স্যালির দিকে ঢেয়ে দেবি ও

কোপের মধ্যে চুক্তি পাখির গঢ়াগড়ি দেখছে।

মানুষের নিকে চাইল মুসা।

'আমরা ওর পোবা জানোয়ারগুলোর দেখাশোনা করতে চাই। সেজন্য ঠাকে কিছু কথা জিজেস করার ছিল।'

'বাবা, মাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। ভিজিটিং আণুয়ার আটটা পর্বত।' বলেই একটা ক্লিপবোর্ড তুলে নিয়ে হাতা সিলেন।

আমরা তিন বছু মুহূর্তের জন্য ঘরকে গেলাম। তারপর ঠাকে অনুসরণ করলাম।

বাইরে থেকে বোবা যায়নি হাসপাতালটা এত বড়। হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যে চলে এলাম নিজেরও জানি না। অবশ্যে বুঝো মানুষদের পোতানির শব্দ অনুসরণ করে চলতে লাগলাম।

করে কী সব আওড়াচ্ছেন।

কান পেতে হাপন ধরে পা চালাই। শোকজন আর বাচাদের কান্না এভিয়ে চলেছি তিন বছু। আমাদের ভিস্টা এমন, যেন কোথায় যেতে হবে জান আছে।

কিন্তু বুজে না পেয়ে ফিরে আসব, এমনি সময় এক মহিলার কষ্ট কানে এল।

'মোরা, ফর্মটা পূরণ করতে পারছি না। বারবার খালি পেয়া জানোয়ারগুলোর হত্ত নিতে বলছে। এত দুর্বিজ্ঞ কেন বুঝতে পারছি না।'

দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিলাম আমরা। মহিলা দু'জনকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখলাম। ওদের পরানে সাদা প্যান্ট ও টপ।

ওরা হাঁক চুরাতেই বেরিয়ে এলাম আমরা, প্রফিটা কামরায় খোঁজ করছি। নার্সরা বেরিয়ে এসেছেন যে ঘর থেকে তারই আশপাশে বৃক্ষ যুদ্ধান রয়েছে।

একটা দরজা মূলে ভিত্তে মাথা গলিয়ে দিলাম। এবং কথাগুলো স্পষ্ট উচ্চতে পেলাম: 'খাবার... দিতেই হবে... আমাকে হাড়বে ন ওরা... অসুস্থ ছিলাম... দু'দিন খাবার দিতে পারিনি বলে... কী মারটাই না মারল...'

বিশেষের আর মুসাও উচ্চতে পেছেছে কথাগুলো।

ঘরের জানালাগুলো কালো পর্যায় ঢাকা। রাতের আধার নেমে এসেছে যেন। এক কেবে একটা বাতি। প্লান হলদেটে আলোর পোটা কামরাটাকে অসুস্থ-রঝ দেখাচ্ছে।

বিছানা থেকে অসুস্থ বিজ্ঞিপ্তিনির শব্দ তেলে এল। ঘরের মধ্যে একটা চেয়ার ও টেবিল দেখে।

আমরা সতর্কে তুকে পত্তনাম ভিত্তে: পা টিপে টিপে সেলাস ঠাক বিছানা লক্ষ্য করে।

মুক্তের গায়ে বাঁক ক'বলাই আছে তবু। সর্বাঙ্গে কালপিটে আব ক'কচিচ। বাহতে টিউ নিয়ে তোব মুজ তেবে আছেন। চুলগুলো সেনে মনে হলো কেউ শুনি আঠা নিয়ে সামা-সামা তুলো সেঁটে নিয়েছে মাথা জুঁড়ে; বুঝো মানুষটাকে এককম নির্ময়ের মত কে মারল?

'খাবার নিতে হবে... ওদেরকে নিয়ে যেতে হবে...' আওড়াচ্ছেন তত্ত্বাবধান।

'ফিটার,' গোয়েন্দালধান বুঁকে পড়ল ওর উপরে। নাক কুঁচকাল ওয়াবের গুঁকে। হাসপাতালের নিজের এক গুঁক আছে। সবাব সজ্জ হত না। মাথাটা শুরে উঠল আমরা।

'ফিটার,' মুসাও মুসু কষ্টে ডাকল।

মাথা কাত করলেন বুক।

ঠুরে জাখ্যাই বাহ স্পর্শ করলাম অমি। শুকনো আব ঠাণ্ডা।

'ফিটার,' কী পালেন আপনি? বেড়াল? প্রশ্ন করল কিশোর।

'হাঁটতে হবে...'

বেড়ালের সোম হাঁটতে হবে নাকি? বেচোরী হয়তো ডাল-পালা ঝাঁঁটা আব বেড়ালের খাবার দেওয়ার ব্যাপারটা শুনিয়ে ফেলেছেন।

'আপনি কি কুকুরের কথা বললেন?' মুসা প্রশ্ন করল।

কিষ্ট আমি কো উঠনে কোন কুকুরের ডাক বলিনি। কুকুর পাকলে নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকত না।

'খাবার দাওগে যাও... যাও...'

মুমিয়ে পাছছে বুক। শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী আব নিয়মিত হচ্ছে। ওকে আলতো করে বৌকুনি দিলাম, কিষ্ট কেন কথা বের করা গেল না।

কাজেই কামরা তাও করতে বাধ্য হলাম আমরা।

'উনি কি বাড়ি বিবরবেন?' স্যালি প্রশ্ন করল।

শ্রাপ করে কাঁধ বদল করলাম ব্যাকপ্যাক।

'হাঁতো, তাৰ দেৱি হবে।'

বাসার কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। বুঝোর বাড়ির দিকে চাইলাম। গাছ-জম্বুদের মাথার কাঁচা দেখা যাচ্ছে। ওদের ভাববান এমন যেন একুনি দেয়াল টপকে উকি লিয়ে দেখবে।

‘আজ্ঞা, রবিন, উনি কি বেড়াকে খাবার দিতে বললেন?’ জিজেস করল  
মুসা। ইতোমধ্যে করেকথার করা হয়ে গেছে প্রশ্নটা।

পুরু আকলাম ওর দিকে।

‘তৃষ্ণি নিজেও তো সব অনেক।’

‘হ্যাঁ, মুসা আকলাম মুসা।

নীচের ঠোটে চিমটি কাটিল কিশোর।

‘এটুকু বোকা গেল উনি কাটাকে খাবার দেন।’

খাবার দেওয়ার ভাবটা আমি নিজের কাঁথে তুলে নিলাম।

সে রায়ে আরেক ক্যান টিউন ছিল থেকে বের করলাম। সৌখ ফ্লানবার  
আগোই তুকতে হবে মুমানের বাড়িতে। ঠিক করলাম, কাল স্টোরে গিয়ে ক্যাট  
ফুড কিনে আনব। প্রয়োজনে এক ব্যাগ কিনব।

গাছগুলো গরের সঙ্গাহ থেকে সৌন্দর্য হ্যারাতে লাগল। ভালুকের মাথা থেকে  
ভাল বেরিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে শিং গজিয়েছে ষাঁড়ের। সবকটা গাছকে কেমন  
জানি অবিন্দন দেখাচ্ছে। সিংহের কেশে অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। ডানা দুটোও।  
ড্রাগনটাকে দেখে মনে হচ্ছে না মেরদণ্ড রয়েছে। ঠিক সেই বেড়ালের মত  
দেখাচ্ছে, বাঁকা হয়ে উঠে নিজেকে যেটা লম্বা করবার চেষ্টা করছে। অবশ্য দাঁত-  
নখ আগেকার মতই শাপিত দেখাচ্ছে সব কটার।

ব্যাগ ভর্তি ক্যাট ফুড দিয়ে যাচ্ছি গত এক হাতা ধরে। রোজ সকালে পরীক্ষা  
করতে গিয়ে দেখি বেমানুম হাওয়া। একেবারে ব্যাগসূক। কীসে খাচ্ছে  
ব্যাগগুলোকে?

জনবার একটাই উপায়। রাতে যেতে হবে ওখানে। গিয়ে নিজের ঢেবে  
দেখতে হবে কী ঘটে।

সে রাতে, বালা-খালু তয়ে পড়বার পর ঘর থেকে বেরোলাম। আমাকে ঘেন  
নিশি ভাকছে। উপেক্ষা করতে পারছি না আমি। আন্তে করে দরজা ভেঙিয়ে  
দিলাম। এক থেকে একশো পর্যন্ত গুণলাম। কিশোর আর মুসা সিনেমা দেখছে  
দেখুক, ওদেরকে রাতিরবেলা কামেলায় জড়াবার দরকার নেই। নিচাত প্রয়োজন  
না পড়লে ভাক না ঠিক করেছি।

জিঙ্গ, বিকার্স আর সোয়েট শার্ট পরনে আমার। ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে  
আলগোছে বিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ব্যাকপ্যাককে যা যা লাগতে পারে সুবই ভরা হয়েছে। খালুর হ্যাম্পলাইট, কাট  
ফুড আর আমার সুইস আর্মি নাইফ।

সাইডওয়েক ফ্রাইলাইটের ডেক্স আলোয় আলোকিত। পেটের দিকে পা  
বাড়ালাম। কাজটা কি ঠিক করছি নিজেও জানি না। দুটো কারণে ফিরেও যেতে  
পারছি না। একটা হচ্ছে, মুমানের বেড়ালের জন্য আজ রাতে খাবার রেখে  
যাইনি। আর সালি রাতে ঘরে রাসে বাক রাখতে আমার উপর। এর কাছে তীক্ষ্ণ  
গ্রাম্যগতি হচ্ছে চাই না।

স্যালির বাসার দিকে এক বালক চাউলি সুলালাম। নীচতলায় আলো জুগতে  
দেখলাম। লিভিংরুমে চিপি জুনের নীচেলে ঝলকানি। উপরতলার ঘরটা-স্যালি  
মেটার ঘাস-অক্ষকার।

দেয়ালের কাছে এসে ঘমকে দাঁড়ালাম পেটের সামনে। আরপর নুক তরে  
ঘাস টেনে পা রাখলাম ভিতরে।

ইয়ার্টে তুকতেই ছমছম করে উঠল সারা শরীর। প্র্যাটেগুলো আরও বাড়ত  
হয়েছে। নখর আরও দুইশি মেঢ়ে গেছে যেন ভালুকটা। ভ্রাগনটাকে দেখাচ্ছে  
ডাইনোসরের মত। ষাঁড়ের কাছে বর্ষ আর মাথায় শিং থাকে যেতলোর। সিংহটার  
হেমন একটা পরিবর্তন দেখা গেল না, তবে ডানা দুটো থেকে যেন পালক  
গজিয়েছে।

পা টিপে টিপে শোটার দিকে এসেলাম। টপিয়ারিগুলোর দিকে তাকাচ্ছি  
না।

হাতঙ্গ ধরে টানতেই ধাতব দরজাটা কিনিয়ে উঠে খুলে গেল। হ্যাশলাইট  
ছেলে নিলাম। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে জুলত বলের মত ঘূরে বেড়াতে লাগল আলো।

কাট ফুডের ব্যাগটা প্র্যাটেগুলোর কাছে রোখে শেডে এসে মাটিতে বসলাম।  
ঘন্টাখানেক দেখে তারপর বাড়ি চলে যাব। ঘড়ি দেখলাম। দশটা তিন।

বসে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডা জন্মে যাওয়ার দশা। হাতে হাত ধুব গুরম  
করবার চেষ্টা করছি। হ্যাশলাইট নিডিয়ে দিলাম। ঠান্ডা উঠেছে, কলে সমস্যা হলো  
না।

ঠাদের আলোয় গাছগুলোর দূরবহু আরও প্রকট হলো।

আধাৰে আউটলাইন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি। কিন্তু ঠাদের ঝপোলী  
‘আলোয় বিচির সব ক্লপ ধৰল গাছগুলো। আকাশের পটভূমিতে অসম্ভব বড়  
দেখাচ্ছে ওদেরকে। সুস্থিতা বাতাস খেলে গেলে ঠকাঠক বাড়ি খেল ডাল। পাতার  
খসড়ানি পুরানো অবস্থাটা ফিরিয়ে আনল আমার মধ্যে। আবারও মনে হচ্ছে  
কেউ যেন শোগনে শুক্র করছে আমাকে।

হাঁচ দুটো জোড়া লাগিয়ে চিবুক রাখলাম তার উপর। চলে যাব কিনা ভাবছি।

ইস, বহুরা যদি সঙ্গে থাকত একটা ভয় করত না আমার। এখন তো বেরিয়ে  
মেতে চাইলোও ভৃত্যে গাছগুলোর পাশ কাটাতে হবে।

শেষমোশ ভাবলাম আরও খানিকক্ষণ দেখি। বাতাসটা অন্ত ধামুক।  
হঠাতে সচাকিত হয়ে উঠলাম পেট শুলবার কাঁচ-ক্যাচ শব্দে।

## চার

দম বৰু করে কাঠ হয়ে থসে রইলাম। শুকের মধ্যে ঝুঁপিলের মূল-ধাপ শব্দ।  
কেউ কিংবা কিছু কি ভিতরে আসছে নাকি বাইরে যাচ্ছে? ছেলেবেলায় শুকুরি  
খেলায় চালু ছিলাম। এখন মনে করবার চেষ্টা করছি খেলার কাইদাটা, কী ছিল।  
সত্য সত্য শুকুকাটে হবে আমাকে। এবং ব্যাপারটা খেলা নয়।

গাছগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাতাস শনলন করে বইছে। গাছ-জঙ্গলে  
মাথা মুইয়ে কাকে মেন দেখবার চেষ্টা করছে। আমার মত হাতে কাউকে কি  
দেখছে?

বাতাসের দোলায় দুলছে ভালুকের থাবা। হঠাতে একটা আলো ঝলসে উঠল।  
কার মেন হাসির শব্দ পেলাম।

‘এদিকে এসো!’  
কানা ঝুলের মত ঘূরে মরছে আলোটা। চোখ পিটিপিট করে ভালমত দেখবার  
চেষ্টা করলাম।

‘বেলচাঙ্গুলো দাও। উফ! আমার পায়ের উপর ফেলতে বলেছি?’

আলোকটা আলো জ্বলে উঠল। এবার তার আভায় তিনিটে ছেলেকে দেখতে  
পেলাম, প্রতোকেই আমার চেয়ে বড়। এপাড়াতে আড়া দিতে দেখেছি  
ওদেরকে।

শেভের ভিতরে ঘাপটি মেনে বসে আছি, আলোর নাগালের বাইরে।

‘শুধু তো বলেছ ইয়ার্ড পরিকল্পনা করবে। এখন দেখা যাবে। সবচেয়ে বড়  
ছেলেটি বলল, ফ্লাশলাইটটা উঠিয়ে ধরল। হাসাহাসি তুর করল ওরা।

অপর দু’জনের হাতেও বেলচা। একজন সরে গেছে আলোর কাছ  
থেকে। যারা শুলবার শব্দ পেলাম। অন্য ছেলেটি চারপাশের প্রাণিগুলোকে  
দেখছে।

‘আই, ভাবি, আমার মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হচ্ছে না...’  
যে ছেলেটি কথা বলেছে তার কাঁধে ভাবি, অর্ধাং সবচেয়ে বড় ছেলেটির  
থাবা পড়ল শব্দে।

‘ভয় পাছ, ভরপুর কাহাকা?’

কাঁধ ডলে ঘাড় নাড়ল ছেলেটি। ভয়ে শুধু অবিয়ে গেছে, কিন্তু কেটে পড়বার  
লক্ষণ দেখাল না। হেসে উঠল ভাবি। মাটিতে ফ্লাশলাইট নামিয়ে রেখে মিলে  
গেল আঁধারে।

এখন আর ওদেরকে দেখা যায়ে না, তবে কানে আসবে বৌদ্ধানুভূতির শব্দ।  
কী করছে ওরা? কেন কিছু বি মাটিতে পুঁতছে নাকি কিছু পুঁতে তুলছে?  
পেটের মধ্যে মোড়ু দিয়ে উঠল। ওরা যদি প্রাণিগুলোকে পুঁতে তুলে ফেলে?  
মনে সাহস জড়ে, শেড ভাল করতে বেশ বানিকক্ষণ লেখে পেল  
আমার। ইচ্ছ ছিল না, কিন্তু প্রাণী পুঁতছে এই দুর্ভিজ্ঞতা না সেরিয়ে উপর পাকল  
না। কেন যে এতখনি উৎসব বেথ করছি বে জানে। কিন্তু করছি। আমি মনে  
আলে চাই গাছ-জঙ্গলের শিকড় শিকড়ভাবে মাটির গভীরে গাঁথা ধাক্কুক।

বুড়ো হাসপাতালের জন্য মায়া হচ্ছে। বেচারী বাঢ়ি দিলে এসে বর্ধন দেববেন  
জীর ইয়ার্ড পাঁক হয়ে গেছে, কেবল লাগবে? আঘাত সঙ্গিতে না দেখে আবার যদি  
তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়?

হামাগড়ি দিয়ে এগোলাম। গাছ-জঙ্গলের কাছ দেখতে চাইছি না, আবার  
জানির রেখে যাওয়া ফ্লাশলাইটের আলোও এড়াতে হচ্ছে।

কুসিং এক শব্দ কানে এল এবার।  
জ্যে পেলাম। কাঠের গায়ে পাঁখে যাজে কঠার। ঠক-ঠক-ঠক। বাতাস গতি  
বাড়িয়েছে, আমার আশপাশের প্রাণিগুলোকে দূরুনি দিয়ে যাচ্ছে।

শিউরে উঠলাম আমিও। গলা অবিয়ে কাঠ। কোনমতে ঢোক গিলে স্টান  
উঠে নীড়লাম।

কাউকে ন কাউকে কাজটায় বাধা দিতে হবে। এবং এখনে আমি ছাড়া আব  
কে আছে?

আগে বেড়ে আমার ফ্লাশলাইটটা জ্বালাম। আলোটা ইতস্তত ঘূরে ভালুকের  
নতুন গজানো শিঁ, নিঃহের বাড়তি লেজ আর দ্রুগনের বাঁকা পিঠ ফুটায়ে তুলল।

কাঁচারের শব্দ থেমে নেই। ছেলেগুলো হাসাহাসি করছে। গাছ থেকে পাছে,  
উপিয়ারি থেকে টাপুয়ারিতে, হায়ারাপদের কাছ অবধি পৌছে

যাচ্ছে ওদের হাসির শব্দ।

ছেলে তিনটি মেন সবথানে ছাড়িয়ে গেছে—কাটছে, বুড়ছে। মনটা তেতো হয়ে গেল আমার। সহসা তীক্ষ্ণ ঘৃণা অনুভব করলাম ওদের প্রতি।

‘আই! নিজের চিকিৎকারে নিজেই প্রায় ঘাবড়ে গেলাম। ‘আই! থামও এসব।’

আধাৰ ফুঁড়ে দেয়া দিল একটা মুখ।

আলো ফেন্ডলাম সুরাসির মুখ্যতার উপর। ভ্যানি। বিশালদেহী ছেলেটির মাথায় কমলা বেঞ্জের ছল। চোখ দুটো হলদে। চিড়িয়াখানায় দেখা সিংহের সঙ্গে অসম্ভব মিল ঘৰ্যেছে ও চোখ দুটোর ভয়। জীবিৰ লেশমাত্ দেহৈ।

অপুৱ ছেলে দুটি ভ্যানিন পিছনে এসে দাঁড়াল। পৰম্পৰৰ মুখ তাকাতাকি কৱল ওৱা। বেলচায় ধূলো-মাটি লেগে রয়েছে। ভ্যানিৰ হাতে কুঠার।

‘কী চাই তোমার?’ বাজৰাই কষ্টে জবাৰ চাইল।

‘এই মুহূৰ্তে বাঢ়ি চলে যাও। তোমকে এখানে আৰ এক মুহূৰ্ত দেখতে চাই না। আমি।’ পাস্টি চিকিৎকা হেঁড়ে বলতে চাইলাম। কিন্তু মুখে কথাগুলো জোগাল না। ঠোঁট জিজিৱে নিয়ে মিনিমিন কৱে বললাম। ‘এটা তোমদেৱ ইয়াৰ্ড নয়।’ আশা কৱলাম যথেষ্ট দৃঢ়তাৰ সঙ্গে কথাগুলো আওড়াতে পোৱেছি।

‘তোমার বুঝি?’ ভ্যানি বাঁকা হেনে বলল।

পৰম্পৰৰ আমাৰে জোৱে এক ধাঁকা দিল কৰ্বে। উলৰল পায়ে পিছু হট্টে বাধা হলাম। আমাৰ পায়ে বাঢ়ি খেল ওৱ ঝ্যাশলাইটটা। গত্তিয়ে গেল যাসেৱ উপৰ লিতে। হৃত্তড়ে ছাই খেলে গেল গাছগুলোৱ পায়ে।

‘কী হলো, কোথাৰ বলছ ন বেল? এটা তোমার ইয়াৰ্ড?’

‘তোমোৱা এখানে এসেৱ কেন?’ অন্য কিছু বলবাৰ চেষ্টা কৱলাম। ‘এখনই যদি এসেৱ অৱজ্ঞাৰ কৰ ন কৱো তা হলো কিন্তু বাঢ়িৰ মালিককে বলে দেৱ।’

হাঙু কৰে দেলে উঠল ভ্যানি।

‘কৰিবৰা, বাঢ়ি বলাই জীবিষ তৰ পোৱেছি। তোমোৱা পাওনি? বক্সদেৱ উচ্চৰে মুৰ তাকিতে জলতে চাইল।

ছেলে দুটি কাঁধেৱ উপৰ লিয়ে পিছনে চাইল। তাৰখানা এমন হেন কোন শুদ্ধ অলতে পোৱেছে। জোৰ-বুনু ব্যাকুলে।

‘বুড়েতাৰ একদিন কী আমাৰ একদিন, অনুচ্ছবৰে আওড়াছে ভ্যানি। বক্সদেৱ দিকে দৃষ্টি নেই কোৱা।’ সেৱিন বাগান দেকে রুল লিতে এসে কী অপমানটাই না হলাম। ওৱ সাবেৱ বাগান তচনছ কৱে তবে আমাৰ শাস্তি।

‘আমি বলে দিচ্ছি...’ ভুঁক কৱলাম।

ভ্যানি হঠাতে ঘুৰে দাঁড়িয়েই ঘুসি মাৰল আমাৰ কৰ্বে। মাটিতে ছিটকে পড়ে কৱে। বাতাসেৱ গজিন কানে বাজল এসময়। মনে হয়ো পাতায় চাৰুক হেনেছে। ঘোত কৱে উঠে আবাৰ হাত চালালাম। কাঁপুনি উঠল পাতায়। আমাৰ ঘুলিতলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ডাল-ডালে ঠোকাঠুকিৰ শব্দ উন্দলাম।

পৰম্পৰৰ ভ্যানি আৰ্টিচিকিৰ হেঁড়ে চিতিৰে পড়ে গেল।

আধাৰে ভাল দেখতে পোপ-বাড়েৱ নিতে। ভ্যানিৰ গায়েৱ উপৰ দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। খালি হাতটা মুঠো পাকিয়ে রেখেছি।

এক গড়াল দিল ভ্যানি। কৰ্বে। ওৱ মুখে তিনটো দগদগে গভীৰ কাটা দাগ। আমাৰ মুঠোটা এক নজৰ দেখলাম। অসভ্ব, এটা আমাৰ কাজ নয়। নিমেষে গা-হাত-পা হিম হয়ে এল।

পাতাগুলো খস-খস শব্দ কৱছে, অথচ আমাৰ মাদাৰ একটা ছলও নড়ছে না। মুখ তুলে চাইলাম। বাতাসেৱ হিটেফোটা ও টেৰ পেলাম না।

ওদিকে পাতাৰ অনৰত বসন্তসানি চলছেই।

ধীৱে ধীৱে ঘুনে দাঁড়িয়ে শব্দ লক্ষ্য কৱে। আমাৰে হেন কেউ বাধ্য কৱল ওদিকে ভালাতে। অনেকক্ষণ হোঁড়ে এলে হেন হয়, বাঢ়ি বাজে হুঁপিণ।

কোমের মুঠড়ে ঘুনে দাঁড়ালাম আমি, দুপা হেন দেবে গেছে মাটিৰ গভীৰে। মনে হচ্ছে হেন দুঃখপুন দেখে ছুটে পালাতে চাইছি। যতই প্ৰাপ্যম চেষ্টা কৰছি, অৱেই মহৱ হচ্ছে গতি।

ভ্যানিৰ ঝ্যাশলাইট তখনও পড়ে রয়েছে এক পশে কাত হয়ে। তটী আমোৱ দেখতে পেলাম ওৱ সঙ্গীৱা শিকড় উপত্তি হেলেছে কৱেকষা কোশেৱ। হাতুড়িৰ বাঢ়ি পড়ে বুকেৰ মধ্যে। ভালুক-গাছটা মেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এমন বড় বড় দুটো গৰ্ত। গাছটাৰ তে মাটিতে পড়ে থাকবাৰ কৰা। নেই।

মুখ তুলে চাইলাম।

জৰিৰ উপৰ যখন দাঁড়িয়ে ছিল তাৰ চাইতে অনেকখানি লজ দেখাচ্ছে এৱন।

হাতুসৰ্বৰ আঙুল যেকে উপটিপ কৰে যেভাৱে রক্ষে কৈটা কৈতে পছে, সেভাৱে মাটি হুবুবুৰ কৰে পড়ছে বাঁকা-নগু শিকড়-বাকেড় যেকে। এটা এহনভাৱে দুলছে হেন জোৱা বইছে। অথচ কেৱাল বাকেড়, কাঁচোৱা কোকুলি অৱ

পাতার কীগুনি তুলে এগোছে ওটা। ধীরেসুহে মাথা উঁ করল।  
চোখের জ্বরণায় কানো কেটো। হোক-হোক শব্দ করে নাকটা বাড়িয়ে দিল।  
মুখ হাঁ হয়ে গেল আমার।  
শ্বর ঝুটল না গলায়।  
কেটার ঘেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখজোড়া।  
ভাস্ক-গাছটা বাঁকা শিকড় ফেলে এক কদম আগে বাড়ল। দড়ি বেঁধে যেন  
টেনে তোলা হয়েছে, এমনভাবে উচ্চিয়ে রয়েছে পেঁচায় একটা থাবা। কিন্তু  
কোথায় দড়ি? নিজে নিজেই এগোছে ওটা। ঠাঁদের আলোয় বিকিয়ে উঠল  
নখরগুলো।  
থাবাসদৃশ ডালটা এবার আমার গায়ের উপর পড়তে শুরু করল।

## পাঁচ

আমি ছিটকে পড়লাম ড্যানিস উপর। থাবাটা খপ করে নেমে এল। পাতাগুলো  
স্পর্শ করল জ্যাকেটকে, তিনে দিল।  
পিছন থেকে অন্য ছেলে দুটির আর্তনাদ বনতে পেলাম। বন-বনাং শব্দ করে  
বেলচা পড়ে গেল। মাটির উপরে মিকারের ধপ-ধপ আওয়াজ।  
হাঁচড়পাঁচড়ে উঠে দাঢ়ালাম। ড্যানিস জ্যাকেটটা টেনে ধরে চিৎকার  
ছাঢ়লাম।  
'কী করেছ দেখো!'  
ড্যানিস দেখাদেখির মধ্যে গেল না। স্টান উঠে দাঢ়িয়ে দৌড় দিল গেট লক্ষ  
করে। পিছনে কীসের মেন শব্দ পেয়ে পাই করে ঝুরে দাঢ়ালাম।  
ওরা শিক্ষসূক্ষ উপড়ে ফেলেছে ডানাধারী সিংহটাকেও। ভারী ডাল-পালার  
মধ্যে মাথা ঘুরাছে ওটা। এবার গড়ান দিয়ে উঠে দাঢ়াল, টায়লউইড যেভাবে  
গড়ায় ঠিক তেমনিভাবে। প্রথমে একটা তারপর দুটো ডানাই ঝাপটে নিল।  
মাথাটা পিছনে ঝটকা মারল। গর্জন নয়, মনে হলো বাতাসে সজোরে কেউ বুঝি  
বিশ্টা চাবুক হেনেছে।  
আজ্ঞা অবিয়ে গেল আমার। পড়িমরি দৌড় লাগালাম।  
ওরা ভিতরে চুক্বার সময় পেট লাগিয়ে দিয়েছিল। এখন গেটের কাছে ভিড়

করে পরশ্পরকে ঠোলাঠোলি করছে।

ড্যানি অনাদেখেকে ঠোলে সরিয়ে দিয়ে হাতলা চেপে ধরল। ছেট বাঢ়া  
ছেলের মত ঝুঁপিয়ে ঝুঁপিয়ে কানচে ও। ওর মুখের কাটা দাগ তিনটে দেখতে  
পাচ্ছি। লাল তিনটে লাইন। হাতল ধরে হ্যাচকা টান দিতে ওটা ঝুলে এল হাতে।

'দেয়াল বাও!' ঠেচিয়ে উঠলাম। পিছু ফিরে ঢাইলাম। টাপিয়ারি নড়ে-চড়ে,  
হেলেন্দুলে এগিয়ে আসতে। শক্তদের ছাড়বে না ওরা।

বাতাসে সোনা গুঁক। ডাল-পালার খস-খস, কট-কট বনতে পাচ্ছি।  
গ্যাস্টগুলো গতিতে এগিয়ে, কিন্তু ওরা অসম্ভব লম্বা যে।  
ঘট করে ঘূরে নাড়িয়ে দেয়াল বাইতে লাগলাম। আমি অর্ধেকটা উঠেছি, ওরা  
তর্বন দেয়ালের মাধ্যম চড়ে বসে আছে। এইমাত্র সাইডওয়াকে কিংু করে উঠল  
একজনের খিকার। টপাটপ লাঙিয়ে পড়ছে ওরা।

গালিগালাজের হুরড়ি ছুটিয়ে সৌড়ে পালাচ্ছে। গাতের আঁধারে হারিয়ে গেল  
ওদেশ মিকারের শব্দ। আমি পড়ে রইলাম পিছনে। হাপাতে হাপাতে দেয়াল  
টপকাবার চেষ্টা করছি।

পাথরে ধূমা ধূমে আঙুল ছড়ে গেল। পিছনে গাছগুলোর তাড়া করবার শব্দ।  
এবং তার চাইতেও ভীতিক-ভানার বাক্তনি।

ওটার ওড়া শিখতে কতক্ষণ লাগতে পারে?

আমাকে দেয়ালের উপর ঝুঁকে পেয়ে কি হোঁ মেরে তুলে নেবে?

ডাল-পালার বাছ দিয়ে জড়িয়ে ধরে উড়িয়ে নিয়ে যাবে না তো?

দ্রুতর হলো আমার চড়াই বাওয়া।

পিছনে কী যেন চড়চড় করে ছিড়তে বনলাম। ক্যাট ফুড নাকি? ওরা  
কি ওটা ঝুঁজে পেয়ে ব্যাপটা ছিঁড়ে ফেলছে? হ্যাতো বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।

পরমুছুর্তে গোড়ালি চেপে ধরল বীসে যেন।  
লাখি আড়ালাম, কিন্তু আবার চেপে ধরল। এমন শক্ত করে গোড়ালি ঠোলে  
ধরেছে, মোজাস্ক ঝূতো ঝুলে আসবে যেন। পায়ে হোচা লেগে জ্বালা করে উঠল।  
আবারও লাখি হাঁকাতে হাড়া পেলাম।

এবার এক টানে শরীরটা তুলে নিলাম দেয়ালের মাথায়। দেয়াল ধরে ঝুলে  
পড়ে লাক দিলাম নীচে।

মাটিতে পড়ে দুমড়েমুচড়ে গেলাম যেন।

সহসা বাহ চেপে ধরে টান দিল একজোড়া হাত।

## ছয়

‘উঠে গড়ো! জননি! চলে এসো।’

মুসা আবার বাহু ধরে টানছে। কিশোর আর সালিকেও দেখতে পেলাম ওর স্বত্ত্ব।

‘আমাদেরকে ডাক্তানি কেন?’ গোহেন্দ্রাধান উত্ত্বিক কঠে শপথ করল।

‘তেমন্যা সিনেমা দেখাইলে তিস্টার্ব করতে চাইনি।’

সালিক বাসার উচ্চলে উচ্চলে উচ্চলে এগোলাম। সশ্রেষ্ঠ দরজা লাগিয়ে দিল স্বত্ত্ব। হেবেতে বালির বন্ধার মত ছপান করে বাসে পড়লাম।

আবার পাশে ঘটিস্টুট মেঝে বসল সালি, চোখজোড়া বিক্রিত।

‘আবি দেবেছি। ওলেরকে চলাকের করতে দেবেছি,’ কিসকিস করে বলল। ‘তোমার বিপদ দেবে কিশোর আর মুসাকে ডাক দিয়ে এনেছি।’

বাসার মধ্যে অটুট নিষ্ঠাতা। গরম কুকি আর তিনিরের সুগন্ধ নাকে আসছে। কিশোরের নিচে চাইলাম।

‘ওরা পাহাড়ের উপত্তি ফেলেছে।’ বাসের ফাঁকে কেনমতে বললাম। ‘তখু হোড়েনি, কেটেও নিয়েছে।’

স্বত্ত্ব সভায়ে চাইল দরজার নিকে।

‘ওরা জাতু, তই না।’

মুসা বৰ্কলাম। উঠে মাড়িয়েছি কিন্তু জানাল দিয়ে তাকাতে চাইছি না। বন্ধ দরজার পিছেই নিলাপন বোধ করছি। আশা করি গাছগুলো দরজা ভেঙে তিতেবে ঝুকতে পারবে না।

‘ওরা জাতু। আর এখন তো আরও বিপদ। ওলেরকে শিকড়সূজ উপত্তি ফেলে ইয়েহে।’

প্রতি ব্যক্তিটি ধৃতহৃ ইওয়ার পর বাবাট এনে দিল সালি। খেয়ে নিলাম। এটুটু পর, দিন বন্ধ তাকে দলবদ্ধ জানিয়ে বাঢ়ির পথ ধরলাম। মুহামেনের বাঢ়ি যের দুল দেয়ালের নিকে হৃলেও তাকলাম না। প্রাক্টিশো মাথা দেলাতে এন্দুল দেবেতে চাই না। ওরা দেয়ালের ওপালেই আকুক।

ইঠাপ্পী জানাধারী সিঁহটার কথা মনে পড়ল।

পৰদিন নাত্তার টোবিলে আমাকে দেখে জুলি ধালা জানতে চাইলেন, শরীর ঠিক আছে কিনা। আমাকে নাকি মুন দেখায়েছে। বললাম, কোন সমস্যা নেই—ভাল আছি। ছাড়ে যাওয়া হাত দুটো ব্যাসের লুকিয়ে রাখলাম।

কুন্দেরকে গতরাতে ঘটনাটা সবিজ্ঞাপ বললাম।

‘খাইছে! আবেকেটু হলেই তো ধরে ফেলত তোমাকে,’ মুসা মন্তব্য করল।

‘মুসা তিনজন থাকলে ওরা গাছ কাটিৰ সাহস পেত না,’ মুসা জোৰ গলায় বলল।

হয়তো তাই। আমরা যাহাতো বাধা দিতে পারতাম।

যাকগে, যা হওয়াৰ তা তো হয়েই গেছে; মীচের টোটে চিমতি কেটে বলল কিশোর। ‘এখন দেখা যাক ঘটনাটা কেন্দ্ৰৰ গড়ায়।’

বিকেলে স্যালিৰ সঙ্গে দেখা কৰতে পেলাম আমরা। বাসার বাইৱে স্যাললেৰ উপর বসে ছিল লিল।

‘নতুন আৰ কিছুই ঘটেনি,’ বলল। ‘আজো, গাছগুলো কি চলে গেছে?’ এলিয়ে এসে জানতে চাইল। মুহামেন রহস্যৰ বাড়িটোৱ দিকে বাৰহৰ চাইলে। আমরাও। দেয়ালেৰ ওপাৰে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এমনকৈ প্রাক্টিশোৰ মাথা পৰ্যন্তে না।

শ্রাপ কৰলাম।

‘কি জানে।’

‘এখন আমাদেৱ কী কৰা উচিত, কিশোর?’ মুসা জিজেস কৰল।

মীচের টোটে চিমতি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান। দেয়ালটোৱ দিকে চাইল।

‘অপেক্ষা কৰা আড়া গতি নেই।’

এভাৱে আৰও চাৰটে দিন কেটে পেল। ইতোমধ্যে এ পাত্তা থেকে একটা পুতুল আৱ একটা বেড়াল উধাও হয়েছে।

খালুৰ বিশ্বাস বল থেকে কয়েটিৱা এসে হাল দিয়েছে। কিংব কয়েটিৱা গতিৰ টায়াৰ ঝালিয়ে দেবে কেন? ভালিবা মুহামেন ইয়াৰ্টে অপকৰ্ম কৰে আসবৰু গৱেৰ লিন সকালে দেখা যাব, সালিদেৱ গতিৰ টায়াৰ চিৰে কলা-কলা কৰে দিয়েছে মেউ। আৰ কয়েটিৱা মানুভূৱ বাসার দৰজাৰ ইঞ্জিবামেক লো আঁচড়ই বা কাটতে যাবে কোন দুঃখে? আবুৰ বাসার দৰজাৰ আঁচড়েৰ দাপ দেখা গেছে। কয়েটিৱা পাল মেটাল গাৰ্বেজ ক্যান চিৰে ভিতৰেৰ ভিনিসও থেকে যাবে না।

মিশিৰ ভাক

অুঠ কারা যেন খেয়েছে। গোটা রাত্তা জুড়ে সে বাতে এসব আচর্য কাওই ঘটেছে।

‘পৰদিন সকালে আমরা স্যালিৰ সঙ্গে বসে ছিলাম ওদেৱ বাসায়।

‘ব্যাপৰটা খাবাপেৰ দিকে যাচ্ছে,’ চিঞ্চিত মুখে বলল কিশোৱ।

‘মা তো আমাকে সকালৰ পৰ বেৱোতে বাবণ কৰে দিয়াছে। মার ধাৰণা এটা খাৰাপ হেলেৰ কাজ।’

সোকার হাতলে কজি ঝুকলাম আমি।

‘কী কৰা দৱকাৰ হীল কৰছি আমি,’ বললাম।

‘কী?’ একসঙ্গে প্ৰশ্ন কৰল তিনজন।

বৃহদেৱ দিকে চাইলাম।

‘ওগুলোকে আবাৰ পুঁততে হবে। আৰ খাওয়াতে হবে বোনমিল। হার্ডওয়াৱেৰ দোকান থেকে আৱেক বতা জোগাড় কৰে আনব।’

নাক ঝুঁচকল স্যালি।

‘ঁড়েটা কি সত্তা সত্তা হাড় থেকে বানায়?’ শিউৱে উঠল ও।

শুণ কৰলাম। ‘কে জানে।’

‘যা কৰাৰ তাড়াতাড়ি কৰতে হবে,’ বলল মুসা।

‘হ্যা,’ সায় জনাল কিশোৱ। ‘যানুষেৰ কুকুৰ-বিড়াল হারানোটা ভাল কথা নয়।’

‘ওৱা হঁয়তো ভয় পেয়ে পালিয়েছে,’ বলল স্যালি।

মাথা ঝাকালাম। তাই যেন হয়। উঠে দাঁড়ালাম।

‘আজকে ওদেৱকে পুঁতব আমৱা। সক্ষ্যৱ পৰ।’

স্যালিকে সাহায্য কৰবাৰ কথা বললাম না। বেচাৰীকে খামোকা বিপদে জড়াতে চাই না। সে-ও মুখ ফুটে আমাদেৱ দলে যোগ দেওয়াৰ কথা বলতে পাৱল না।

বিদায় নিয়ে আমৱা তিন বন্ধু বাড়ি ফিরে চললাম।

স্যালিদেৱ বাসাৰ উপৰে, সূৰ্য কমলালেৰুৰ গঁঁ ধৰলে বেৱোলাম আমৱা। মুসাৰ হাতে খালুৰ বেলচাটা শোভা পাচ্ছে। গেট দিয়ে ঢুকবাৰ চেষ্টা কৰলাম না আমৱা। সে বাতে গেট খোলা যায়নি। কাজেই সুবিধাজনক জায়গা দিয়ে দেয়াল টপকাৰ ঠিক কৰেছি। আজ্ঞা, হাঁচাই একটা চিঞ্চা যাই মাৰল আমৱা যাবায়। গাছগুলো কি পেট দিয়ে বেঁচিয়েছিল নাকি দেয়াল টপকে? নাকি পক্ষীৱাজ শিংহটাই একা উড়ে

বেঁয়ো এসেছিল?

ঘটনা আৱও পাকিয়ে উঠবাৰ আগেই কাজে নামতে চেয়েছি আমৱা। চাইনি আৱ কোন কুকুৰ-বেড়াল খোয়া যাক। তা ছাড়া, মনেৰ মধ্যে আশঙ্কাৰ কাজ কৰেছে, এৱপৰ হয়তো আৱও বড় কিছুৰ উপৰ দুটি পড়ুবে গাছ-জৰুৰোৱ। তাৰ আগেই এদেৱ পেট ভৱাৰৰ কাজটা কৰতে হবে আমাদেৱ।

বোনমিলেৰ বঙ্গটা ডয়ান ভাৰী। ওটাৰ গায়ে দড়ি পেঁচিয়েছি। মুসা টেনে তুলে নেবে দেয়ালেৰ উপৰে। বেলচাটা মুসা ছুঁড়ে মাৰল ওপাৱে। দেখানে খুশি পড়ুবলে। মুসা আগে দেয়াল বেঁয়ে উঠতে দৰ কৰল।

হার্ডওয়াৱ স্টেটৰ থেকে তিনজোড়া ওয়াৰ্ক গ্রাজস কিনেছি। এৱ ফলে চড়াই বাওয়াৰ কাজটা বানিকৰ্তা সহজ হবে।

দেয়ালৰ মাথায় চড়ে বসে বঙ্গটা টেনে তুলে নিল মুসা। ওপাশেৰ মাটিতে বতা নামাতে সাহায্য কৰল দড়িটা। এবাৰ লাকিয়ে পড়ল নীচে।

কিশোৱও দেয়াল টপকে নেমে গেল ওপাশে।

এসৰ আমাৰ পাৱল।

ইয়াউটোকে দেবে মনে হোৱা কেউ যেন ট্ৰাইট চালিয়েছে এটাৰ উপৰ দিয়ে। বিশাল সব গৰ্ত এখানে-ওখানে। গহৰতলোৱ চাৰগালে ঘাস মৰে গেছে। প্লাটিটলো একপাশে কাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। সবুজ পাতাগুলো এখনও অবশ্য চকচক কৰেছে। লৰক কৰলাম কাটা জায়গাটা থেকে সিংহ-গাছটাৰ নতুন শিকড় গজাচ্ছে।

আমাদেৱ হাতে সময় বেশি নৈই। যে গৰ্ততলো রয়েছে সেগুলো খুড়তে দৰ কৰল মুসা। সবাৰ আগে ভালুক গাছটাকে বসাতে চাই আমৱা।

গৰ্ত খুড়বাৰ পৰ ধৰে বাখতে হলো গাছটাকে। আশা কৰছি যুমিৰে রয়েছে ওটা। ইঠাঙ কৰে জেগে উঠে চমকে দেবে না।

গাছটাৰ শাখা-প্ৰশাৰা মোচড় খাচ্ছে আমৱা হাতেৰ মধ্যে। শুধু গতি, মোটা কেঁচোৱ মত পাক খাচ্ছে।

‘খাইছে!’ মুসা অফুটে বলল।

এক লাকে পিছে সৱে পেলাম, কিন্তু ওটা উঠে দাঁড়াল না। দস্তানা টেনেন্টুনে পৱে চেপে ধৰলাম আবাৰ।

সজ্জাতিক যেনা লাগছে আমৱা। গাছেৰ মত নিখিৰ নয় ওটা। গাছেৰ মত লাগছেও না ওটাৰ স্পৰ্শ। এৱকম কোন কিছুত আগে কখনও হাত হৌয়াইনি আমি। পাতাগুলো অন্তত গৰ্জ ছাড়াছে। ঝজিটোৱ ভিতৰ এৱকম গৰ্জ পাওয়া যায়।

গাছটার সঙ্গে যুক্তি, আমাৰ জ্যাকেট আৱ জিঃ চিৰে দিল ওটাৰ ডাল।  
এৰাৰ দিলোৱও হাত লাগল আমাৰ সঙ্গে। দু'জনে মিলে গতিৰ মধ্যে বসালাম  
ওটাকে। বেলচা মেৰে মাটি ভৱাট কৰছে মুসা।

একটু পৰে অনাঙ্গলোৱ দিকে মন দিলাম।

আকাশৰ দিকে বাৰবাৰ দৃষ্টি চলে যাচ্ছে। মুখ্যনেৰ ইয়াতে দ্রুত আধাৰ  
ঘনাচ্ছে। দেয়ালৰ নীচ দিয়ে যেন উড়ি মেৰে ইয়াতে প্ৰবেশ কৰছে অক্ষকাৰ।  
এখনে আৱেকবাৰ আটকা পড়বাৰ কোন ইয়েছে নেই আমাৰ।

'হাত চলতে চাইছে না আৰ,' বলল কিলোৱ। সমানে কাজ কৰে চলেছি তিন  
বৰু। ঘেমে নেয়ে গেছি।

'উহ, হাত ব্যাথ হয়ে গেছে,' বলল মুসা।

'আৰ একটু,' সাজুন দিলাম অমি।

সিংহটা বাদে আৰ সব প্ৰ্যাণ্ট যখন পোতা হয়ে গেল তখন রাত নেমেছে।  
সিংহ-গাছটাকে সবাৰ খেয়ে ধৰলাম। বাৰবাৰ মনে হচ্ছে নভাচড়া কৰছে ওটা।  
কাজ আমিয়ে, দুৰ চেপে রেৱে একদণ্ডে চেমে থাকছি। যখন নিশ্চিত হচ্ছি গাছটা  
হিৰ রয়েছে, বিশ্বে দ্রুততাৰ সঙ্গে কাজ সারবাৰ চেটা কৰছি। ভানি যেহেতু  
গাছটাৰ পাঞ্চলো কেটে দিয়েছিল, আমাদেৱকে নতুন এক গৰ্জ ঘূড়তে হলো।

ইতোমধ্যে বাতাসেৰ বেগ বেড়েছে। পাঞ্চলো যখনই নাড়া থাচ্ছে বাতাসে,  
অতকে-অতকে উঠাই। মুখে পাতাৰ ঘৰা লাগলে হাত আটকাই।

বাতাসেৰ দেলালৰ মড়া হাড়েৰ মত আমাদেৱ দিকে তেড়ে আসছে ডাল-  
পাল। আৰ গলার কাছে উঠে আসছে আমাৰ হৰ্ফপিণ্ড।

হয়ে এসেজে আৰ, নিজেকে প্ৰবোধ দিলাম।

পিঠ ব্যাথ হয়ে গেছে। সিংধ হয়ে দীড়লাম। প্লাটস খুলে আকাশৰ দিকে  
মুৰ তুলে তাকালাম। ইথৎ লালচে রঙ ধৰছে। মুদুৰুন বাতাসে, পাতাৰ পাতায়  
ঘৰা খেয়ে সৱ-সৱ শব্দ তুলছে প্ৰ্যাণ্টগুলো। ঠাণ্ডা লাগছে আমাৰ। আচমকা বাতাস  
থেমে গেল।

কাঠ হয়ে গেলাম। উৎকৰ্ষ। অস্বস্ত শব্দ পেলাম কি? কিছু কি সত্তে উঠল?  
বাতাস ছাড়াই কি দূলে উঠল কিছু? বৰুৱাৰ আচমকা হয়ে গেছে।

চোক পিলালাম, কিন্তু গলাটা পকলো ঢেকল। দেয়ালৰ দিকে চাউলি বুলিয়ে  
দিলাম। সমৰ হত ও পৰ্যন্ত পৌছতে পাৰব তো?

আচমকা আমাৰ কাঁধে আকৃষণ্ণলো চেপে বসল।

## সাত

আত্মিকাৰ ছেড়ে নৌ কৰে মুৰে দীড়লাম। বোনমিলেৰ বক্তাৰ হোচ্চট বেয়ে  
ঘাসেৰ উপৰ পড়ে পেলাম।

এক লাকে শিষ্ঠ ইটল স্যালি।

বিলোৱ আৰ মুসা হো-হো কৰে হেমে উঠল। ওৱা স্যালিকে আসতে  
দেবেছে। আমাৰক বলেনি। আমাৰ ভড়কানিটা খুব উপকোগ কৰেছে দু'জনে।

উঠে বসে কটমট কৰে চাইলাম ওৱা দিকে।

'তুমি এখানে কী কৰছ?'

চাৰধাৰে আত্মকাৰী চোখ দুটো বুলিয়ে নিল মেৰোটি।

'সাহায্য কৰতে এলাম। তোমাদেৱ অনেক সহজ লেপে যাচ্ছে দেখে। আৰুৰ  
হয়ে গেছে তো।'

উঠে নৌচিয়ে বোনমিলেৰ বক্তাৰ তুলে নিলাম।

'ই, জানি। এখন এটা তথ্য ছাড়িয়ে দেয়া বাবি।'

নাক কুঁচকালেও হাত পাতল স্যালি। বক্তাৰ মুৰ খুলে সবাৰ হাতে খালিকটা  
কৰে হাড়েৰ উঠোঠা তুলে দিলাম। স্যালি গাছগুলোৰ কাছে পেল না। ঝুট ঠিনেক  
মুৰে মেৰেই ঝুটে দিল পোড়া লক্ষ্য কৰে।

'কতবাবি গভীৰ কৰে পুঁতেছ?' জিজেস কৰল। বোনমিলেৰ জন্য হাত  
পেতে আৰুৰ। 'মা তো মুকুট গভীৰে বাবু পৈতে।'

জু কুঁচকাল গোৱেন্দাৰ্থান।

'আমৰা তাৰচেৱে নীচে পুঁতেছি।'

বাতাস গতি পেয়েছে, কলে প্ৰ্যাণ্টগুলোৰ মধ্যে পিহৰণ দেখা গেল।

চৰকিব হত মুৰে দীড়ল স্যালি।

'কীসেৰ শব্দ?'

'বাতাস। এসো, সিংহটাকে বাৰবাৰ দিতে হবে,' বলল মুসা।

গাছটার কামে বাৰবাৰ পৌছালাৰ কীতিমত কঁপছে স্যালি। আমাৰ অবহাৰ  
তৈৰেট। অবশ্য ধৰাব কৰলাম না।

বোনমিলেৰ বেশিৰভাগপুৰু লেৰ। আমাদেৱ কাগড়-চোপড়ে লেপে অনেকটা  
নিশিৰ ভাক

নষ্ট হয়েছে। চক্রের উড়োর মত সব জায়গায় লেগে যায় জিনিসটা।

এক মুঠো উড়ো সিংহটার নিকে ছুঁড়ে দিল কিশোর। নতুন খোঁড়া গতে বাঁকা ক্লিমাস ট্রীর মত দাঢ়িয়ে উট। পার্থক্য একটাই, অন্য কোন গাছকে কোনদিন এতটা ভীতিকর দেখায়নি আমার চোখে।

কেন জানি মনে হচ্ছে আমাদের কাজ-কর্ম পছন্দ করতে পারছে না উট। বুকের মধ্যে তব জাকিয়ে বসছে।

'যাবে এখন?' ফিসফিস করে বলল স্যালি।

মাথা বাঁকালাম। অব্যক্তিকর অনুভূতিটা ফিরে আসছে। কে যেন গোপনে লক্ষ করছে।

দৌড়ে গেলাম দড়িটা যেখানে নেথে এসেছি। খানুর বেলচাটা বাইবে ছুঁড়ে দিয়ে স্যালির উদ্দেশ্যে বলল, 'দড়ি বেয়ে উঠে ওপালে নেমে যাও। আমি ধরে ধাক্কা ব।'

যাবা নেড়ে বাইতে অক করল ও।

আনু দড়াবাজ বলবার উপর নেই ওকে। উৎসাহ জোগাতে হলো আমার। বহুক্ষণ লেগে গেল ওর দেয়ালের মাথায় পৌছতে। ইতোমধ্যে ঝুপ করে করেন্ডের ডানার মত আঁধার নেমেছে চারপাশে।

পিঠ বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে আমার। জ্যাকেটের ভিতরে ড্যানক গরম।

মূসা গায়ের জোরে দড়ি টেনে ধরে রেখেছিল। স্যালিকে হড়কে নেমে যেতে বলল ওপারে। ও নেমে গেলে তিল পড়ল রশিতে।

পিছনে এসের পাতার ঘর্ষণ করতে পেরাম। পিউরে উঠল সর্বাঙ্গ।

'আইছে!' মূসাও উন্নতে পেয়ে পিছু ফিরে চেয়েছে।

ইয়ার্টে জনাটি অক্ষকার এমুহূর্তে। তারার আলোয় আধার কাটেনি। খস-খস। পর মুহূর্তে বিদ্যুটে এক ফেঁসকেঁসানির শব্দ।

বোনমিলের বক্সাটার দিকে চাইলাম।

'শক্ত করে দড়ি ধরে থাকে,' মূসা চেঁচাল স্যালির উদ্দেশ্যে। পিছনে অভূত শব্দটা যেমে গেছে। 'রবিন, উঠে পড়ো।'

আমার ঘাড়ের রোম দাঢ়িয়ে পেছে। যত শ্রুত পারি উঠবার চেষ্টা করছি দড়ি বেয়ে। উপরে পৌছে কিছুক্ষণের জন্য অমকালাম। গাছগুলো জামি ছুঁড়ে বেরিয়ে আসবে না তো?

'রবিন?' স্যালি তকনো, ড্যার্ট গলায় ডাকল।

ওকে চুপ করতে বলে কান পাতলাম। সো-সো শব্দটা জোরদার হয়েছে।

চারদিক থেকে আসছে বলে মনে হলো। মিটিভিট করে জলে উঠল স্ট্রীটলাইট। এবার ভাল করে দাঁটিগোচর হলো বিষয়টা।

গাছ-জাতগুলোকে কেউ দেন এপাশ-ওপাশ দোলাচ্ছে। কালিগোলা অক্ষকার জমিতে দৃষ্টি দিলাম। গাছগুলোকে ঠিক মত পুঁততে পারিনি। পিক্কতসুন্দ উঠে আসবার চেষ্টা করছে ওরা। সেজন্মাই ওই ফৌস-ফৌসনির শব্দটা পাচ্ছিলাম। এবার সেটা বুক হলো।

'কী হচ্ছে কী ওখানে?' স্যালি প্রশ্ন করল। 'তোমার বকুলা উঠছে না কেন?'

দেয়াল বেয়ে নামতে লাগলাম আমি। মাটিতে নামবার পর শরীর ছেড়ে দিল। ক্লান্তিতে চলে পড়লাম। 'এখন কাজ হলৈই বাঁচি।'

একটু পরেই কিশোর আর মূসা একে একে নেমে এল এ পাশে।

হাসি ফুটেছিল স্যালির মুখে। কী দেখে যেন সহসা মুছে পেল। 'ও' হয়ে গেছে মুখটা।

আমরাও মুখ তুলে তাকলাম।

দেয়ালের মাথার কাছে ঘাপটি মেরে রায়েছে বাষ-গাছটা। থাবায় লেগে রয়েছে তাজা মাটি। তারযানে যথেষ্ট গভীরে আমরা ওটাকে পুঁততে পারিনি। গাছটা মুক করে নিয়েছে নিজেকে। যাখা দুলাচ্ছে দু'পাশে, কাঠের গোঙ্গনির শব্দ উচ্চে তার ফলে। ওটার বেড়ে ওঠা নবর তীক্ষ্ণ আঁচড় কাঠে দেয়ালে।

স্যালির হাত চেপে ধরে দেয়ালে গা মিলিয়ে দাঢ়ালাম। তারপর এক হাতে ওকে টানতে টানতে শুভি মেরে এগোতে লাগলাম।

হৌক-হৌক শব্দ করছে ওটা। কারও মুখে টু শব্দটি নেই।

স্যালির দিবে চাইলাম। গাছটার নিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

'ওদিকে চেয়ো না,' বললাম।

'রবিন, বাসায় চলো,' ফিসফিস করে বলল পোয়েন্ডাপ্রধান। ও আর মুসাও ওড়ি মেরে এগোচ্ছে।

দেয়ালের উপরদিকে পাতা ঘাম থাচ্ছে। পরমুহূর্ত ফুটপাতের উপর পতনের আয়-আম শব্দ।

ইয়ার্টে এগারে লাক্ষিয়ে নেমে পড়েছে ওটা।

স্যালির হাত আকে ধরে উঠে দাঢ়ালাম আমি এবং ঘোড়ে দোক দিলাম। পিছনে বাষ-গাছটা ফৌস-ফৌস করে তেড়ে আসছে।

কীসে যেন হোট খেয়ে পড়ে শেলাম।

'খেয়ে না,' চেঁচালাম বহুদের উচ্চেশ্যে। উঠে দাঢ়িয়ে তুলে নিলাম মেটায় নিশ্চির ডাক।

হোচ্চ খেয়েছি। খালুর বেলচাটা। ক্রিকেট ব্যাটের মত দু'হাতে চেপে ধরলাম  
ওটাকে। তারপর ঘটি করে ঘুরে দাঢ়ালাম।

পাতার শব্দ তুলে দেয়ে আসছে গাছটা। যথাসম্ভব দেরি করলাম। তারপর  
বাগে গেয়ে, ধৈর করে পুল শট খেলবার মত করে চালিয়ে দিলাম বেলচা।

মাথা নোয়ানো ছিল, ফলে চমৎকার সংযোগ হলো বাঘের মুখের সঙ্গে।  
ক্রিকেট বল হলে সীমানার বাইরে উড়ে যেত ডায় মিড ইইকেট দিয়ে। কিন্তু  
এটার শুধু একটা বাঁকানো দাঁত খসে পড়ল।

মট করে ডাল ভাঙল। বস-বস শব্দ তুলে টেলমল পায়ে পিছু হটল শক্ত।  
বেলচাটা ছুঁড়ে মারলাম ওটাকে লক্ষ্য করে। তারপর ঘুরে দাঢ়িয়েই ছুট দিলাম  
বিড়কি দরজার উদ্দেশে।

স্যালি আর মুসা ভিতরে আগেই চুকে পড়েছে। কিশোর আমার জন্য আলতো  
ফাঁক করে ধরে রেখেছিল দরজাটা।

'জানি!' হিসিয়ে উঠল।

এক দৌড়ে ভিতরে চুকে দাঢ়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম। বাইরে ঝটার  
শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দরজায় আঠড় কাটছে ডাল-পাল। গায়ের রোম খাড়া হয়ে  
গেল। মনে হচ্ছে একটা সাইক্রোন বৃথি ভিতরে চুকাবার চেষ্টা করছে।

জুলি খালি এসময় কিটেনে এসে অবাক চোখে আমাদের দিকে চাইলেন।  
স্যালিকে দেখে হাসি ফুটল ওর মুখে।

'আরে, কী ব্যাপার, তুমি? ও, রবিনদের সাথে বক্সে হয়ে গেছে বুথি?'

মাথা বাঁকাল স্যালি।

'খুব ভাল। আই, তোদের কাপড়-চোগড় এত ময়লা হলো কী করে রে?  
কানা খেঠেছিস নাকি? যা, এক্সনি ওয়াশিং মেশিনে রেখে আয়...কী বাতাসটাই  
না দিচ্ছে, বাপরে! মনে হচ্ছে গাছগুলোও ফোস-ফোস করছে...স্যালি, ডিনার  
করে যাবে কিন্তু।'

'উনি পদিকটায় আছেন,' স্যালিকে বললাম আমি। ওকে নিয়ে হাসপাতালে  
এসেছি আমরা। হলঘর ফাঁকা রায়েছে দেখে নিয়ে চারজনে পা চালালাম যুম্যানের  
ক্রম লক্ষ্য করে।

'উনি কি বলতে পারবেন কীভাবে ওগুলোর হাত থেকে বাঁচা যায়?' প্রশ্ন করল  
স্যালি। ফ্যাকসে সবুজ দেয়ালে লটকানো ছবিগুলো দেখেছে।

'গ্লান্টগুলো তো ওরই,' বলল কিশোর।

'তা হলে উনি কেন তাড়ালেন না?'

'চাননি হয়তো,' বলল কিশোর।

'কিংবা হয়তো অসুস্থ বলে পারেননি,' যোগ করল মুসা। 'অনেকদিন ধরে  
অসুস্থ হিজুন উনি।'

'এখ-' একটা টুপ করো,' বললাম আমি।

জু কুঁচক আমার দিকে চাইল ও। মুখে অবশ্য কিছু বলল না।

যুম্যানের কামরায় মাথা গলিয়ে দিলাম। তারপর হাতছানি দিয়ে বক্সেরকে  
ডেকে পা রাখলাম ভিতরে।

জানালার পর্দা সরাবো। বেশ খানিকটা দূরে পাহাড়সারি আর পাইন গাছের  
জটলা দেখতে পাচ্ছি। বুঁড়ো মানুষটার কাছে হেঁটে গেলাম।

\* বুঁড়োর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। আশা করছি উনি চোখ মেলে  
চাইবেন। আমাদেরকে অজানা কিছু জানাবেন।

'তোমরা কী করছ এখানে!'

চমকে উঠলাম। ঘুরে দাঢ়ালাম চরকির মত। সেদিনের সেই নার্স জুলত  
চোখে আমাদের দিকে চেয়ে।

'আ-আমরা...' তো-তো করে বলতে গেল মুসা।

সামনে এগিয়ে গেল পোয়েন্টার্ডান।

'আমরা ওর পাশের বাসায় থাকি। উনি কি শীঘ্ৰ সেৱে উঠবেন?'

নাৰ্সের চোখের দৃষ্টি খানিকটা নৰম হলো।

'সৱি। উনি কাল রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অনেক বেশি অসুস্থ।'

আমার দিকে চাইল বক্স।

'ধন্যবাদ। এসো,' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর। তারপর কী মনে  
করে ঘুরে দাঢ়াল। 'উম, উনি কি ওর পোষা জৰুর সম্পর্কে কিছু বলেছেন?'

মাথা নেড়ে যুম্যানের দিকে দৃষ্টি ফিরালেন নার্স।

'কই না তো। তবে কী যেন একটা কাজ করে দিতে বলছিলেন। বেচারী  
বুঁড়ো মানুষ। বলছিলেন, আমি কি এক জায়গায় যেতে পারব?—কোথায় তা অবশ্য  
বলতে পারেননি!'

হাসপাতালের বাইরে এসে জ্যাকেটের চেন টানলাম। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

পকেটে হাত ভরে ইঠা দিয়েছি, ইঠাং থমকে দীড়িয়ে হাসপাতালের দিকে  
ফিরে চাইলাম। হাসপাতাল-বিভিন্নের বেশ খানিকটা শিছনে যেন আকাশ হুঁচে

বুঢ়ো কোথায় পাঠাতে চাইছিলেন নাৰ্সকে? গাছগুলোৱ দিকে আৱেকবাৰ দৃষ্টি বুলালাম। তাৰপৰ থপ কৰে কিশোৱেৱ ঘাষতে ধৰে, আমাৰ দিকে মুখ কৰে দাঢ়ি কৰিয়ে দিলাম। 'তোমৰা এখানে দাঢ়িও, আমি যাৰ আৰ আসব'। বলেই সোজা আৱাৰ হাসপাতালোৱ উদ্দেশে পা বাড়লাম। আলগোছে চলে এলাম বৃক্ষৰ কেবিনে। ঘৰে কেউ নেই। 'ওৱা...ওৱা মানুৰ মাৰতে তুৰ কৰবে,' বিড়বিড় কৰে আওড়াছেন বৃক্ষ। ওৱ ট'পৰ ঝুঁকে পড়লাম।

'আপনি আমাৰ কথা তনতে পাছেন?' বললাম।

ঘোলাটো চোখ মেলে চাইলেন উনি। 'গাছগুলোকে জঙ্গলে নিয়ে যাও, 'অস্পষ্ট কষ্ট আওড়ালেন। 'বাঁচাৰ...এটাই...একমাত্ৰ...পথ।... আমি ভুল কৰেছি। আমাৰ...গাছ নিয়ে গবেষণা...কৰা...ঠিক... হয়নি। ওৱা...হিংস্ত হয়ে উঠবে জনলে...' হাতাই কথা বৰ্ক হয়ে গেল ওৱ। ঘুমিৱে পড়েছেন।

যা বুৰুৱাৰ বৈৰা হয়ে গোছে আমাৰ। ফিরে এলাম বৃক্ষদেৱ কাছে।

'বুৰুৱি! উনি কী চাইছিলেন বুৰাতে পেৰেছি! কিষ্ট আমৰা কীভাৱে...আচ্ছা, আচ্ছা! ঠিক কৰোটিৰে মত। উনি পাৰবেন না, কিষ্ট আমৰা হয়তো পাৰব।'

'কী পাৰব?' মুসাৰ কষ্ট বিশ্বায়।

ওলেৱকে খুলে বললাম বৃক্ষৰ কাছ থেকে তনে আসা সব কথা।

'বিবিন বলতে চাইছে, কোয়াটোৱা জোড় বৰিদে শিকাব কৰে,' সব তনে বলল কিশোৱ। 'একটা বিপদে পড়লে আৱেকটা সাহায্য কৰে। আক্ৰমণ এলে একটা লুকায় আৱেকটা মৌড় দেয়। শিকাৰী তখন ওটাৱ পিছু নেয়। ফলে কোনটাই দেভাৱে ক্লান্ত হয় না কিংবা ধৰা পড়ে না।'

'তুমি কোয়াটি ধৰবে নাকি?' স্যালি জিজেস কৰল।

'ধৰ'ব না, সাজৰ। দু'জোড়া কোয়াটি। অবশ্য তুমি যদি সাহায্য কৰো তবেই।'

স্যালিকে খুশি দেখাল না। পাইন সারিৱ উদ্দেশে একদৃষ্টি চেয়ে রয়েছে। এবাৰ আমাৰ দিকে ফিরে তাকিয়ে যাড়ি কাত কৰল। 'আচ্ছা।'

আমাৰ কথা মত স্যালি আৰ মুসা যুম্যানেৱ ইয়াতেৰ গেটি বুলবাৰ কাজে লাগল। আমি আৰ কিশোৱ হার্ডওয়্যার স্টোৱে গেলাম, নতুন একটা ব্যাকপ্যাক ও অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় জিনিসপত্ৰ কিনতে।

ফিরে যখন এলাম, ওৱা ততক্ষণে হাতুড়ি দিয়ে গেটেৱ লক ভেঙে ফেলেছে। ঘড়ি দেখলাম। পাঁচটা চাৰ।

'তোমাৰ বাবা-মা তোমাকে বৌজাবুজি কৰবেন না তো?' কিশোৱ প্ৰশ্ন কৰল স্যালিকে।

মাথা নাড়ল ও।

'ওলেৱকে বলতে মানা কৰছ?'

'হ্যা। আমৰা তো বলতে পাৰি না যে, টপিয়াৰিগুলোকে সৱিয়ে দিছি। ওগুলো যাতে কাউকে খেয়ে ফেলতে না পাৰে। আৱ বললেই বা ওৱা বিশ্বাস কৰবেন কেন?' বলল গোয়েন্দাৰুদান।

নাক ঘৰল স্যালি।

'তা ঠিক। কিষ্ট ধৰো যদি কাজ না হয়?'

'হাতেই হবে!' জোৱ গলায় বললাম আমি। 'যুম্যান একথাটাই বলতে চাইছিলেন নাৰ্সকে।'

ডিনাৱেৱ পৰ বেৱিয়ে পড়লাম তিন বৰুৱা। জুলি খালাকে বলেছি ভিডিও গেম খেলতে যাচ্ছি। উনি বলেছেন নটাৱ মধ্যে ফিৰতে। আমি তো তাৱ আগেই ফিৰতে চাই। অবশ্য আদৌ ফেৱা হবে কি না কে জানে।

যুম্যানেৱ বাসাৰ সামনে আমাদেৱ সঙ্গে মিলিত হলো স্যালি। গেটি খুলে সাইডওয়াকে বসে থাকলাম আমৰা। অপেক্ষা কৰছি। কাৰও মুখে কথা জোগাচ্ছে না। আসন্ন বিপদেৱ আশঙ্কায় সবাই আমৰা চিঞ্চিত। ব্যাকপ্যাকে দু'হাত রেখে বসে আছি আমি।

স্যালি মুখ তুলে চাইল।

'সৰ্ব দ্বৰছে।'

নীলচে-সাদা শ্বীট লাইট লাইট দপ-দপ কৰে জুলে উঠল। তেমন একটা উজ্জ্বল নয় ওটা। আঁধারেৱ পটভূমিতে মিটমিটি কৰে জুলছে নক্ষত্র। মনে হচ্ছে কেউ বুৰি সুইচ টিপে অন কৰে দিয়েছে।

এ সময় কানে এল শব্দটা। মৰ্মৰ ধৰনি। সৱসৱ কৰে ঘাড়েৱ রোম দাঢ়িয়ে গেল আমৰা। বাতাসে মুদু দোলা খেল স্যালিৰ কালো চুল-এবং আৱও কী মেন। চাৰজনেই স্টোন উঠে দাঢ়িলাম।

'ৱেডি?' প্ৰশ্ন কৰল কিশোৱ।

খোলা গেটেৱ দিকে চেয়ে থেকে মাথা নাড়লাম।

হাতাই গেটেৱ কাছে নড়ে উঠতে দেখা গেল একটা ছায়া-শৰীৱ।

## আট

যা ভেবেছিলাম তার চাইতে দ্রুত হানা দিল গোঠ। ডাল-পাতার শব্দ তলে বেরিয়ে  
এল। যদি করেছিলাম ভাঙ্কটা, কিন্তু এত বেশি শাখা-গুৱাখা বেরিয়েছে গোঠ  
থেকে-চিনতে পারলাম না।

'সৌভ দাও' গাঁজে উঠলাম।

বাস্তুর দুনিকে দুভাগ হয়ে দৌড়ি দিলাম আমরা চারজনে।

বেশি জোরে ছাঁটে পায়েই না। ভাঙ্ক করে আসছে গাঁটা। ব্যাকপ্যাকটা  
বাইতে হচ্ছে বলে মহুর হার পড়ছি আমি। এই ফাঁকে একটা কাগজের  
ঢোকা মের করে নিলাম। ঢোকার ফুটা করে বেনহিল ছাড়াতে ছাড়াতে  
ছুটাই।

প্রথম মোড়টার এবন খামলাম আমরা। ছাঁটিতে হাত রেখে দাঁড়িতে রাখেছি,  
কুকুরের বাটাদের বুরল খোয়া। 'ভোঁ আসছে?'

আশপাশে জন-প্রাণীর চিন্ত নেই। সাক্ষাত পরপরই চারপাশ সুন্দরী হয়ে  
বার।

স্যার্লি মাঝা সেকে আঙুল ধাক করল।

বাস্তুতে দুর্ঘটে দুর্ঘটে আসছে দেন। পাশের বাড়ির কল অব বোপ-  
বাক্সের সঙ্গে মিলেমিলে একবার হয়ে গেছে আসুতিগুলো। দুটিপাতে ডালের  
কাঁচিট লব।

'এসো,' বলেই সৌভ দেওয়ার জন্য দুরল কিশোর।

আসেপাসের অর্বের পথ পাঢ়ি দিতেই দ্রুত হয়ে পড়ল স্যালি।

'বাইজ্জে! দেমো না,' দুসা শিষ্ট কিংবে টেঁচাল ওর উদ্দেশে।

বিস্ত ও কাঙটাই করল স্যালি। পিছনে এক বলক চেয়ে বসে পড়ল  
সাইডওয়ার্কে। আমি সৌভে গোলাম ওর কাছে।

'উঠে পড়ো। এখানে বসে থাকলে মরবে।'

মাথা নেড়ে হীপাতে লাগল ও।

'আর...সৌভতে...পারব...না...'

'তা হলে ওই বারান্দাটায় শিরে চৃপচাপ বসে থাকোগে যাও। ওরা পার হয়ে

গেলে হাসপাতালে চলে যেয়ো, কেমন?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল ও। তারপর কোনমতে শরীরটা টেনে-হিচড়ে আমার  
দেখিয়ে দেওয়া বাড়িটার উদ্দেশে এগো।

সাইডওয়ার্কে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা তিনজন, চোখ-কান খোলা রেখে।  
স্ট্রাইটলাইটের আলোর নীচে ক্রমেই সরু আর লঘু হচ্ছে আমাদের ছায়া। পিছনে  
বস-বস আওয়াজ উঠতে লাফিয়ে উঠলাম আমি। কোপ থেকে বেরিয়ে এল একটা  
বেড়াল। পায়ে ধূপ-ধাপ শব্দ করে তাড়লাম। ঘুরে যখন দাঁড়ালাম, চলত কোন  
কিছু চোখে ঝড়ল না।

সবার আগে দেখল গোঠকে মুসা।

'রবিন, সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল।

বাস্তু চাবুক চালাবার হতন সী করে একটা শব্দ। মাথা নোয়ালাম আমি।  
কীসে বেল ধাবা মেরেছে আমার ব্যাকপ্যাককে। কাপড় ছিড়ে গেল ফড়-ফড় করে।  
হাতিতে পড়ে গোলাম। মুখে বান্টা মারল শীতল বাতাস। পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেল।  
উপর নিকে তাকালাম।

অব্যাল প্রাইটগুলো দশ স্কুট মত দূরে। দ্রুত দূরত্ব করিয়ে আনছে। পাতায়-  
পাতায় শিহরণ অর আলোর নাচন। সামনের পা আগে ফেলছে, তারপর পিছনের,  
আবাব সামনের-এভাবে হেলেনুলে এগোজ্জে ওরা। পাতাতো মাথাতো দুলিয়ে  
তরেই ধরে ফেলছে আমাকে।

তিন পর্যন্ত তৃণলাম। ওদেরকে একেবারে কাছাকাছি পেতে হবে। আমি চাই  
না ওরা স্যারিকে দেবাতে পাক।

বকুরা দাঁড়িয়ে আমার পাশে। বিদেনে আমাকে একা বেলে পালারুন। ওরা  
জানে আমি কী চাই।

বুকের মধ্যে হাপনের বাড়ি। অনুষ্ঠ বোধ করছি। অপেক্ষ করছি।

ভাঙ্ক-গাছটা মেই মাঝ ঝুঁকে পড়েছে আঘাত হ্যানবার উদ্দেশে, ঘুরেই  
নিলাম সৌভ।

ধাওয়া করছে ওরা।

ছুট্টেই চলেছি তিন বকু। বুকটা আরেকটু হলেই ফেঁটে যাবে বেল। বখন আব  
খাস নিতে পারছি না তখন দাঁড়ালাম। পিছনে ওদের অনুসরণের শব্দ ঠিকই তুলতে  
পাইছি।

পিছনে বনভূমি নিয়ে দাঁড়ানো হ্যাসপাতালটা আমার সামনে। পৌছে গেছি

আয়, বকলাম নিজেকে। এবার উলতে উলতে ছুট নিলাম আবার। বকুরা আমার  
নিশিব ডাক।

চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

‘স্যালি কোথায়? ওর তো এসময় আশপাশে থাকবার কথা। তব পেয়ে পালিয়েছে নাকি?’

একটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে পার্কিং লটের চারধারে দৃষ্টি বুলালাম। ও ধাক্কে ওলিয়েই ধাকবে। আমার আর ছুটবার ক্ষমতা নেই। কিশোর আর মুসার উপর দায়িত্বটা চাপাতে হবে। গাছগুলোকে জঙ্গে পৌছে দিক ওয়া।

একটুক্ষণ বিশ্রাম না নিয়ে আর পরা যায়ে না। শক্রদের হাতে এখন ধরা পড়ে গেলেও করবার কিছু নেই। আমার। ঝুঁকে, হাঁটুতে হাত ঝুঁকে হাসফাস করাই।

‘বিবিম?’

মুখ ভলে দেখি স্যালি। পেরেছে তা হলো? ঘুর পথে পৌছে গেছে।

হাতছানি দিয়ে মুদা আর কিশোরকে ডাকলাম।

‘ওগুলোকে জঙ্গে চুকিয়ে দাও,’ বুক তরে শাস টেনে বললাম। ‘যুম্যান ওকথাই বলতে চেয়েছিলেন...বন! বনে...যাও!’

ব্যাকপ্যাক হাতড়ে আরেকটা ঠোঙা ধরিয়ে দিলাম কিশোরের হাতে। আর একটা মাত্র রয়েছে।

‘কেন্দ্রে বেশি কাছে এসে পড়ে তা হলে ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে দৌড় দেবে,’ বললাম।

গাঢ়গুলোর পিছনে উরু হয়ে বসে পড়লাম আমি। মিনিট পাঁচেক, এরমধ্যেই আশা করছি নম কিনে পাব।

গুলেরকে এভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমি এ দৃঢ়ুর্ত নিকুপায়।

বুকিতে বসে থাক দৌড়বার চাইতেও খারাপ। এই মনে হচ্ছে পাতার আওয়াজ পেলাম, তো এই আবার ভল ভাঙবার হট শব্দ অন্তরে পাঞ্চ। সবই কঙ্কন। মনের পদ্মায় দেখতে পাইছ ভালুকটা পৌছে গেছে গাঢ়িত ক্যাছে। থাবার পাটিকা মাদল বলে। নম ফিলে দেয়ে উঠে দাঢ়িলাম। প্যাকিপছে শীতিমত। কল্পনার লিকে এগোলাম।

গোল থালার মত জান উঠেছে পিছনে। ফুটপাতে নয়, মাটিতে ঘবা থেরে হতকে শেল আমার পা। পাইন গাছ-ফিসফিসে শব্দ তেলা কালো গাছগুলো আমার সন্দেশে অক্ষবার এক দেয়াল খাড়া করে দিয়েছে। দিক, এরা যে ঠোঙা বরছে না তাই যাবেটি।

ছুটিছি, পাথরে ঠোকর খাচ্ছি। পড়ে গিয়ে হাতের তালু ছড়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে চারধারে নজর বুলালাম। ছায়া, তখুন ছায়া সারি সারি। পাইনের জঙ্গল দেখ করে শিশ কেটে যাচ্ছে বাতাস। এবার আরেকটা শব্দ আমার মনোযোগ কেড়ে নিল। বাতাসে কেউ যেন চাবুক আঢ়াল।

দৃঢ়ায় করে আমার পিঠে এসে পড়ল সিং-গাছটির কাটা উঠি। মুখ ঘুরড়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। নিজেকে টেনে দাঁড় করিয়ে ঘুরে চাইলাম।

মুহূর্তের জন্ম চাকা পড়ে গেল চান্দ। ঘন পাতার কারণে নি঱েট দেখাচ্ছে তান দুটো। হাঁ করল ওটা। জের বাতাসে পাতার কাঁপনির যে প্রচও শব্দ উঠল, কানে হাত চাপা দিতে হলো আমাকে।

এবার সহসা যেমন এসেছিল তেমনি মিশে গেল রাতের আকাশে।

পক্ষিরাজ সিংহটা এখনও জঙ্গে গেকেনি। স্থাবীনভাবে উড়ে বেগাচ্ছে। ব্যাকপ্যাকটা পিঠ থেকে নামালাম।

তিনি নব্য ঠোঙাটা পেলাম না। তার বদলে আবিকার করলাম ব্যাকপ্যাকের একটা কোনা ছেঁড়া। তিনে হাত ভরে পকেট লাইটা ঝুঁজে নিলাম। এবার ব্যাকপ্যাকটা ধপ করে পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে হাঁট গেড়ে বসলাম। হাতড়ে হাতড়ে বোনমিরে ভূতীয় ঠোঙাটা ঝুঁজিছি।

সিং-গাছটার আবার হিতের আসবাব শব্দ পেলাম। দ্রুত হাতড়াচ্ছি। পাথরে-মাটিতে ঘবা থাচ্ছে হাত। লাইট জুলবার সুযোগ পেলাম না। শৌ-শৌ আওয়াজটা ডেজাল হয়েছে। মাথার উপরে কম-ধৰ্ম শব্দ।

মাটিতে ভাইত, দেব জানত ওটা। ফলে, নেমে এল সী করে। আমার জ্যাকেটে জড়িয়ে গেল কী যেন। চান দিয়ে তুলে নেওয়া হচ্ছে আমাকে, টের পেলাম। শৰীর মুচড়ে ফিপার খুলবার চেষ্টা করছি। শেবমেশ খুলতে পারলাম। মাটি থেকে পা দুটো শূন্য ভেসে উঠেছে, এ সময় গা থেকে জ্যাকেটটা খসিয়ে ফেললাম। পরমুহূর্ত মাটিতে ধপ করে পড়ে ঝুঁকড়ে পেলাম। আমাকে কতখানি উঠিয়েছিল ওটা? মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। এর পরের বার আর ছুল করাবে না ওটা, টানাটানি করাবে না কাপড় ধরে। শৰীরে শ্রেষ্ঠ দারিয়ে দেবে শান্তিম নবর।

চোখ থেকে চুল আর ঘাম সরিয়ে মাটি হাতড়াতে লাগলাম। ব্যাগটা গেল কেৰাবার।

শ্রশ করে বাতাসে শব্দ তুলল গাহের পাতা।

কাগজে চেপে বলল আমার আঙ্গুল। পুরানো ব্যবরের কাগজ নাকি অন্য কিছু

ও নিয়ে মাথা ঘোলাম না সে মৃহর্তে। ঘুরে দাঢ়িয়েই হুঠে মারলাম। পরক্ষণে  
মাটিতে বাঢ়ি খেল আমার পিঠ। চাঁদটাকে আড়াআড়ি পাশ কেটে জঙ্গলে উঠে  
গেল গোঁজটা। চাঁদ ঢাকা পড়ল সিংহ-গাঁজটার ডানার আড়ালে। অপেক্ষা করছি।  
এবার কাত হয়ে ভাসতে দেখলাম ডানা দুটোকে। বনের গাছ-পালার উদ্দেশে  
উঠে পেল সিংহ-গাঁজ।

'রবিন? রবিন?'

কিশোরের গলা শুনে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম।

পরবৃহর্তে, কখনো পাতার যান-যান শব্দ করে আমার পাশে এসে দাঢ়াল ওরা  
তিনজন। উঠে দাঁড়ালাম। সারা গায়ে ব্যথা। বনভূমির দিকে হাঁটা দিলাম।  
বন্ধুদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললাম, 'আমি চিংকার-চিংকার দিলে দৌড় দিয়ো।  
কাজ হলো কিনা দেবে আসি।'

চাঁদের আলোর সব কিছু সাদা-কালো দেখাচ্ছে। কাঁপা হাতে পকেট লাইটটা  
জ্বালালাম। আলো জ্বাল না দেখে তালুতে বাঢ়ি দিলাম। এবার ম্যান এক চিলতে  
আলোর রেখা ফুটল।

পায়ের নীচে ভাঙছে পাইনের কঁটা। শান্ত খাকবার চেষ্টা করছি। ডাল-পালার  
নানা রকম শব্দ করে আসছে। হাঁটা দিলাম শব্দ লক্ষ্য করে। হাত কাঁপছে, ফলে  
একেবেংকে যাচ্ছে আলোটা।

খানিকটা ফাঁকা মত জমিতে অন্যান্য গাছ-গাছালির সঙ্গে দাঢ়িয়ে ওঠলো।  
ব্যাভাবিক গাছের মত দিবি দুর্লাচ্ছে। এমনকী পক্ষীরাজ সিংহটাকেও ওখানে  
দেখলাম। হাঁটু মড়ে বসে লক্ষ করছি। মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছে। শাখা-  
প্রশাখা মাঝি খুঁড়ে ইঁদুরের মত গর্তে ঢুকছে। গাছ-জ্বরগুলো শরীরের মুঢ়াচ্ছে, এবং  
তার ফলে ওনের আকৃতি বদল হচ্ছে। জন্মলের প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক  
গাছের রূপ ধরছে ওরা। আশা করা যায় আর সব গাছের মত স্বাভাবিক জীবন  
ফিরে পাবে এবার। কেননা আর তো কেউ গবেষণা করবে না ওদেকে নিয়ে।  
কাজেই জন্ম-জন্মারের সঙ্গে কোন মিলও পাওয়া যাবে না এখন থেকে। ভালোর  
খটাখটি থেমে গেল। মাটি ঝোঁড়া বক হয়ে গেছে। কোথায় যেন একটা পেঁচা  
ডেকে উঠল। এবার বাতাসে যে শব্দ উঠল, সেটি পাতার স্বত্ত্বাবজ্ঞাত মর্মরধনি।  
এবং পাইনের নীর্ঘন্তা।

আমিও নীর্ঘন্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি হলাম  
বন্ধুদের। ওরা আমাকে একা ছেড়ে নিশ্চিত হতে পারেনি। পিছু-পিছু চলে  
এসেছে। বুকটা ভরে গেল।

১৪২

ভলিউম ১৯

'আপনি চাইলে আমরা আপনার ইয়ার্ড পরিষ্কার করে দিতে পারি,' প্রস্তাব  
করলাম আমি।

হাসি মুখে মাথা নাড়লেন উনি।

'ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে তোমাদের চায়ের দাওয়াত। কাল বিকেলে  
আমার বাসায় আসছ তোমরা।'

সানন্দে রাজি হলাম আমরা। পেটে হাত বুলাল মুসা। হাসি দু'কান অবধি  
ঠেকেছে।

\*\*\*

\*  
পরদিন স্যালির সঙ্গে ওদের বাসায় দেখা করতে গেলাম। আমাদেরকে দেখেও  
হাসল না ও।

'দু' হঞ্জার জন্ম আমার বাইরে দেখেন নিয়েধ; বলল।

ওর পাশে বসতে গিয়ে 'উঁ' করে উঠলাম। গায়ের ব্যথা করেনি।

'আমরা কোথায় গেছিলাম বলতে গেলে কেন?'\*

ও জবাব দেওয়ার আগেই মুখ্যনের বাসার সামনে একটা গাড়ি এসে  
দাঢ়াল। আমরা মুখ তাকাতাকি করলাম। উঠে দাঢ়িয়ে সোজা নীচে নেমে এলাম।  
হেঠে গেলাম রাস্তার পাশে।

নার্সের সাহায্য নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন যুমান। হাতে প্রকাও এক  
লাঠি।

'আচ্ছা, কিশোর, গাছগুলো হাঁটার অমন খেপে উঠল কেন?' মুসা জানতে  
চাইল।

ইন্দুনীঁ উনি হয়তো ঠিক মত খাবার দিতে পারছিলেন না। যে কারণে  
থেপে উঠেছিল ওভলে, 'ব্যাখ্যা করল কিশোর। 'ভয়কর হয়ে উঠেছিল। আর  
ড্যানিমা উপরে তোলায় পোয়াবারো হয়ে গেছিল গাছগুলোর। আক্রমণ শুরু  
করেছিল।'

'ভদ্রলোক ইয়ারের দশ দেখে কেঁদেই ফেলেন কিনা কে জানে,' বলল  
স্যালি। নিয়েধ ভুলে ওঁও চলে এসেছে আমাদের সঙ্গে।

যুমান আঠি ভর দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। গেটের কাছে এসে থমকে  
গেলেন। চেয়ে রয়েছেন একদুর্বিতে। এবার নার্সের উদ্দেশ্যে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'এটা আমার বাড়ি তো?' অনিচ্ছিত কঠো বললেন।

নার্স মাথা ঝাঁকালেন।

বাড়ির দিকে চাইলেন উনি।

'কী অস্তু! অস্তুত লাগছে। হাসপাতালে শয়ে গাছের ব্যপ দেখতাম অথচ  
বাড়ি ফিলি দেখি মুক্তভূমি।' এগোতে শিয়ে থেমে গেলেন আমাদেরকে দেখে।  
স্যালিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হাঁটা, তোমাকে চেনা-চেনা লাগছে। আমি  
চার্লিস ব্যানার্ম্যান।'

এক লাকে তাঁর কাছে চলে পেল স্যালি।

'হাঁই, আমি স্যালি। আর এরা আমার বাড়ি কিশোর, মুসা আর রবিন।'

আমরা একে বৃক্ষের সঙ্গে হাত মেলালাম।

নিশির ভাক

১৪৩